



একটি  
মেয়ের  
আত্মকাহনী

■ অবধূত ■  
৬

# একটি মেয়ের আত্মকাহিনী

অবধূত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯



বাস্তব, ১৩৮০

মার্চ, ১৯৭৪

প্রকাশক

কল্যাণব্রত দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীমলকুমার গরাই

রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস

১২, বিনোদ সাহা লেন

কলিকাতা-৬

আট টাকা

কাল্পন, ১৩৮০

মার্চ, ১৯৭৪

প্রকাশক

কল্যাণব্রত দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেন্স রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীমলকুমার গরাই

রামকৃষ্ণ সারিদা প্রেস

১২, বিনোদ সাহা লেন

কলিকাতা-৬

আট টাকা



কন্যাগীয়া -

নগিতাকে

এই লেখকের  
তুমি ভুল করেছিলে  
উদ্ধারণপুরের ঘাট  
অনাহত আছতি  
মরুতীর্থ হিংলাজ  
মন মানে না  
স্বামীঘাতিনী  
সজিনী  
সাধনা  
ইত্যাদি



এটি একটি আত্মকাহিনী।

আমার আত্মকাহিনী নয়, তুলসীর আত্মকাহিনী। এই কাহিনী তুলসীরই লেখা উচিত ছিল। পারেনি বেচারী, সময় ছিল না। তাই আমাকেই এই কাহিনীটি লিখতে হচ্ছে।

লেখবার জন্তে আমাকে ভার দেয়নি তুলসী, আমিও তাকে কথা দিইনি লিখব বলে। কিন্তু বিশ্বাস করে ফেলেছিল তুলসী যে তার কাহিনীটা আমি লিখব। বিশ্বাস করেছিল বলেই সব গুনিয়েছিল।

যা মুখ ফুটে বলা যায় না, যা শোনানোও উচিত নয়, তাও শুনিয়েছিল।  
যদি আমি না লিখি এই কাহিনীটি তা'হলে বিশ্বাসঘাতকতা করা  
হবে। যদি কখনও কোথাও দেখা হয় তুলসীর সঙ্গে, আমায় জিজ্ঞাসা  
করতে পারে—“খামকা কেন শুনেছিলেন আমার কাহিনী? লিখবেন  
না তো শুনলেন কেন?”

কি জবাব দৌব তখন ওকে!

সত্যি সত্যিই কি আমি ওর আত্মকাহিনী শুনতে চেয়েছিলাম!  
মোটাই না, একদম নয়। অপরের কাহিনী শোনবার ফুরসত কই  
আমার, নিজের কাহিনীগুলো নিয়েই আমি হিমশিম খেয়ে মরছি।  
শোনবার গরজ ছিল না আমার বিন্দুমাত্রও, ওর কিন্তু শোনাবার গরজ  
ষোল আনা ছিল। তাই ও শুনিয়েছিল, যা মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়  
তাও শুনিয়েছিল। এই বিশ্বাসে শুনিয়েছিল যে একদিন আমি ওকে  
নিয়ে একখানা উপাশাস লিখে ফেলব।

কেন যে এই অদ্ভুত ধারণাটা গজিয়েছিল ওর মগজে তা ওর  
জবানিতেই শোনাই।

“আচ্ছা, যত বই লিখেছেন তার চরিত্রগুলো সবদেখেছেন আপনি,  
তাই না?” এই প্রশ্নটি প্রায়ই করত তুলসী। আজো বাজে জবাব  
দিতাম। একদিন বলে বসলাম—“তোমার কি মনে হয় তাই বল।  
চরিত্রগুলো সব চেনা মানুষ আমার, ওরা কেউ আমার মনগড়া মানুষ  
নয়, একথা ভাবছ কেন?”

তুলসী বললো—“মনগড়া মানুষ! মানে কল্পনা করে করে ঐ সমস্ত  
চরিত্র সৃষ্টি করেছেন! কিছুতেই নয়, আমি বিশ্বাস করি না। ওদের  
আপনি দেখেছেন, ওদের সঙ্গে মিশেছেন, ওদের সুখ দুঃখ আশা  
আকাঙ্ক্ষা সব জানতে পেরেছেন। কল্পনা করে ঐ রকম লেখা যায়!”

ওর ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করিনি। করলেও কোনও ফল হোত  
না। এ কথা ওকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না যে কাগজের ওপর



কালির আঁচড় কেটে যাদের সৃষ্টি করি আমি তারা শ্রেফ কালির  
আঁচড়, কালের হাতের ছাতা গোবর পড়বে যখন ঐ আঁচড়গুলোর ওপরে  
তখন ঐ কালির আঁচড়ে তৈরী জীবগুলোর একজনও টিকে থাকবে না।

সত্যিকারের রক্ত মাংসে গড়া জ্যান্ত চরিত্র সম্বল করে সেই চরিত্রের  
আত্মকাহিনী লেখা যায়। এক বিন্দু কল্পনার রঙ লাগাব না, প্রতিজ্ঞা  
করে অতি সাবধানে ছকে যেতে হবে ঘটনার পর ঘটনা, ঠিক যেটি যে  
রকম ভাবে শুনেছি বা দেখেছি তার ছবছ বর্ণনা দিতে পারলে খাঁটী  
আত্মকাহিনী তৈরী করা যায়। তাই করছি আমি, প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে  
তুলসীর আত্মকাহিনী লিখছি। বড় ভয় ছিল তুলসীর, বার বার  
আমায় সাবধান করে দিয়েছিল। বলেছিল—“মনগড়া কথা একটি  
বলতে পারবেন না। লিখতে যদি হয় তা’হলে খাঁটী ব্যাপারগুলোই  
লিখবেন। সে বই পড়ে মানুষে হাসবে কি কাঁদবে তা নিয়ে মাথা  
ঘামাবার দরকার নেই। ভাল মন্দ যা খুশি ধারণা করুক লোকে তাতে  
আমার বড় ব্যয়েই গেল। পাছে আমার সম্বন্ধে কতকগুলো আজগুবি  
ধারণা করে নিয়ে বই লেখেন এই ভয়ে আপনাকে সমস্ত শোনাচ্ছি।  
একটি কথা বাদ দোব না, সমস্ত খোলাখুলি বলব—সমস্ত।”

বাধা দিইনি। কেন দিইনি বাধা, কেন মন দিয়ে শুনেছিলাম  
তুলসীর কাহিনীটা, তাই ভাবছি। আপসোসও হচ্ছে। সেদিন যদি  
বাধা দিতাম তুলসীকে, যদি বলতাম যে কোনও কালে তোমাকে নিয়ে  
কিছুই আমি লিখব না, তা’হলে নিশ্চয়ই ও শোনাতে বসত না ওর  
জীবনী। আমি বাঁচতাম, আজ এই পণ্ডশ্রম করে মরতে হোত না।

পণ্ডশ্রম!

হ্যাঁ, মনে প্রাণে জানি পণ্ডশ্রমই করছি। এ কাহিনী কেউ পড়বে  
না, কারণ এতে ঝাল মসলা নুন নেই। একঘেয়ে সেই থোড় বড়ি  
খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়, ব্যাননে বাঞ্ছনা নাস্তি। এ চিজ মুখে  
তুলতে কার প্রবৃত্তি হবে!



ঐ প্রবৃত্তির জন্মেই তুলসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার আগে ওকে দেখেছিলাম পাড়ার এক অনুষ্ঠানে। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব, বিরাট প্যাণ্ডেলে ছেলে বুড়ো আঙা বাচ্চা হাজার তিনেক মেয়ে পুরুষ জমেছে। এক-ভয়ানক নামজাদা প্রধান অতিথি ভাষণ দিতে শুরু করলেন। মিনিট দশেক চুপচাপ কাটল, তারপর শুরু হোল হৈচৈ। অসম্ভব ভিড়ে বসবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছিল আগেই, সেই ঝগড়া ক্রমে হাতাহাতিতে পৌঁছয় আর কি। মাননীয় প্রধান অতিথি মশাইকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে গান শুরু করতে হোল। মাইকে ঘোষণা শুনতে পেলাম—“এখন একখানি শ্যামাসংগীত গাইছেন শ্রীমতী তুলসী পাল।” সেই প্রথম দেখলাম তুলসীকে, শিল্পী মঞ্চে উঠে ছ’ হাত জোড় করে মাথা হুয়িয়ে প্রণাম করলো। তারপর বসে পড়ে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শুরু করলো গান—‘বল রে জবা বল—’

ব্যস, একদন ঠাণ্ডা। বিরাট হৈ হট্টগোল মুহূর্ত মধ্যে উবে গেল, বহুবার শোনা গানখানির প্রথম কলিটি বার তিন চার উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ডেলসুদ্ধ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল যেন। একের পর এক চারখানি গান গাইতে বাধ্য হোল তুলসী, তারপর সভার কাজ শূন্যস্থলে এগিয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, শিল্পী আনাদের পাড়ার মেয়ে, পাঁচুবাবুর বাড়িতে ওরা ভাড়াটে এসেছে।

মনটা দমে গেল। পাঁচুবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে থাকবার মানুষ নাকি ঐ শিল্পী! ঐ হতচ্ছাড়া বাড়িতে ক’দিন ওরা টিকতে পারবে! কেন, আর কি কোথাও বাড়ি জুটল না!

ঐ পর্যন্তই, তারপর ওর কথা ভুলে গেলাম। কোথাকার কে, পাঁচুবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে আছে এমন এক মেয়ের কথা কতক্ষণ মনে থাকতে পারে। শ্যামাসংগীত এমন জিনিস যে লোকাল ট্রেনে ছ’ ডজন

ফেরিওয়ালার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্ধ ভিখিরীতে যখন গায় তখনও কান পেতে শুনি। ঐ পর্যন্তই, ট্রেন থেকে নামবার আগেই গান আর ভিখিরীর কথাবেমানুম ভুলে যাই। এও তাই হোল, পাঁচুবাবুর বাড়ির ভাড়াটে তুলসীকে অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ভুলে গেলাম।

ভুলে গেলাম বটে, কিন্তু ভুলে থাকতে পারলাম না। কয়েকদিন পরে স্বয়ং তুলসী এসে উপস্থিত হোল। প্রণাম করে বললো—“আপনি যে এখানে থাকেন জানতাম না। এইমাত্র শুনলাম, শুনেই ছুটে এসেছি।”

ছুটেই এসেছে বটে, দেখলাম দস্তরমত হাঁফাচ্ছে। বললাম—“বস, বস। তোমার সঙ্গে কিন্তু আমার আগেই পরিচয় হয়েছে।”

“কবে! কোথায়!” তুলসীর দুই ভুরুর মাঝখানটা কঁচকে গেল।

“তুমি মনে করতে পারবে না। সেদিন যারা তোমার গান শুনেছে তারা তোমায় ভুলতে পারবে না। হাজার তিনেক মানুষকে তুমি যাছ করে ফেলেছিলে। গান যদি না ধরতে তখন তা’হলে দারুণ কেলঙ্কারি বেধে যেত। স্বামীজীর জন্ম অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম। তিন হাজারের বেশী মানুষ শুনেছে তোমার গান, ক’জনকে তুমি চিনবে। তিন হাজার মানুষ সেদিন তোমার পরিচয় পেয়ে গেছে।”

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে তুলসী বললে—“শ্রামাসংগীত ভালবাসেন বুঝি? যখন হুকুম করবেন তখনই শোনাব আপনাকে। আমাকে কিন্তু তাড়িয়ে দেবেন না।”

“তাড়াব! তাড়াব কেন!” আকাশ থেকে পড়লাম।

“আপনি লেখক, আপনি কত বড়, আপনার সামনে আসতে পেরেছি এই কত ভাগ্য। আপনি যদি বিরক্ত—”

চোখ পাকিয়ে বললাম—“বিরক্ত হব যদি বাজে কথা বলে বিরক্ত কর, এই যেমন করছ। এই সব ভদ্র ভদ্র কথা যদি না বল তা’হলে যখন ইচ্ছে যতবার ইচ্ছে আসতে পার। আমিও যখন ইচ্ছে যতবার ইচ্ছে যেতে পারি তোমাদের ওখানে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। ঐ



বাড়িটায় কেন ভাড়াটে এলে তোমরা ? এত বড় সহরে ঐ পাঁচুবাবুর বাড়ি ছাড়া কি অণ্ড কোনও বাড়ি মিলল না ?”

মাথা হেঁট করে মেঝের ওপর নজর রেখে তুলসী বলল—“অণ্ড বাড়িতে আমাদের ভাড়াটে রাখবে না।”

হাঁ করেছিলাম কি যেন বলবার জন্তে, কথাটা গিলে ফেলে ওর পানে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ বলে ফেললাম—  
“ঐ বাড়িতে থাকতে তোমার প্রবৃত্তি হয় ?”

মুখ তুলে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে তুলসী বললো—“ওরাও তো আমার মত মানুষ, আমি যে ওদেরই একজন।”

সেদিন ওর কথাটা মানতে কোথায় যেন আটকে যাচ্ছিল। মানতে না পারলেও তর্ক করতে প্রবৃত্তি হোল না। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে গেলাম। বললাম—“সত্যি সত্যি তোমার নাম তুলসী ! চমৎকার নামটি কিন্তু। আমি যদি নাম রাখতাম তোমার তা’হলে শুধু তুলসী রাখতাম না, তুলসীর আগে বাবুই বসিয়ে বাবুই তুলসী নাম দিতাম।”

আবার কঁচকে গেল ওর দুই ভুরুর মাঝখানটা, স্পষ্ট তিনটি রেখা দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করল—“মানে ?”

“বাবুই তুলসী কি জান না বুঝি। বনতুলসী, অদ্ভুত একটা গন্ধ আছে সেই তুলসীতে।” আবার ঘোরাতে চেষ্টা করলাম বক্তব্যটা, ওর গায়ের রঙ বাবুই তুলসীর মত এ কথাটা বলা যায় না।

তুলসী কিন্তু কি যেন সন্দেহ করে বসল। বললে—“গন্ধ ! কিসের গন্ধ পাচ্ছেন আপনি ? তেল পর্যন্ত মাখি না আমি, গন্ধ কিসের পেলেন ?”

“সংগীতের”—ব্যাপারটাকে আরও রহস্যময় করে তুলতে হোল। চোখ বুজে গুরুগম্ভীর চালে বলতে লাগলাম—“এই ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। কেউ আমার সামনে এলে আমি নানা রকমের



গন্ধ পাই। ঐ গন্ধ থেকেই বুঝতে পারি মানুষটা কেমন। এটা আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটা আছে বলেই বই লিখতে পারি।”

“তা’হলে বলুন না আমি কেমন মানুষ?” পেড়াগীড়ি জুড়ে দিলে তুলসী। সামনে বুকে আমার পায়ের ওপর হাত রেখে বলতে লাগল—“বলুন, বলতেই হবে আপনাকে। না বললে কিছুতেই ছাড়ব না আমি।”

“বিপদে ফেললে দেখছি।” খুবই নাচার হোয়ে পড়লাম যেন। মাথা চুলকে বললাম—“বলাটা কি ঠিক হবে! তোমার সামনে তোমার বিষয়ে বললে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। এ পর্যন্ত যতবার যাকে বলেছি ততবারই গোলমাল পাকিয়ে বসেছে। মুখ দেখাদেখি রহিত হোয়েছে অনেকের সঙ্গে, এমন কি কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত শত্রুতা করে যাচ্ছে।”

“না, আমি ওসব কিছুই করব না। বিশ্বাস করুন আমাকে—” তুলসী এবার জুত করে গুছিয়ে বসে বলতে শুরু করলে নিজের সম্বন্ধে। আমাকে আর একটি কথা বলতে হোল না। আমার কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্মে আসেও নি তুলসী, নিজের কথাই বলতে এসেছিল। বলবার গরজ ছিল ওর, তার কারণটি আগেই শোনালে।

“হয়তো এর পর এমন একটা বই লিখবেন আপনি, যাতে আমি থাকব। আমাকে দেখে আমার গন্ধ পেয়ে যা বুঝেছেন তাই লিখবেন নিশ্চয়ই। আমার বড় ভয় যদি আপনি ভুল করে ফেলেন। ভুল হোতেও তো পারে। তার চেয়ে আগাগোড়া আমার জীবনের ঘটনা-গুলো আপনাকে বলে রাখি। এই ঘটনাগুলোই ছবছ লিখবেন আপনি, তা’ পড়ে যার যেমন খুশি হবে ধারণা করে নিক। কেমন?”

মাথা হেলিয়ে আমার চোখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইল। আমিও চুপ করে রইলাম, ফলে ও বুঝল ওর প্রস্তাবটি মেনে নিলাম। তারপর শুরু করল।

শুরু করেছিল ঠিকই, শেষ কিন্তু করতে পারেনি বেচারী। কারণ

সময় পেল না। শেষ করবার আগেই কচিবাবু এসে উপস্থিত হোলেন।  
সাক্ষাৎ কচিবাবু, যাকে কাঁচাবাবু বললেও ভুল বলা হয় না।

পাঁচুবাবুর পুত্র কচিবাবু। ছনিয়াটা নাকি গোলাকার, এবং  
ছনিয়ার ছ' দিক নাকি চেপ্টা। ছনিয়ার প্রতীক হচ্ছেন কচিবাবু, তাই  
উনিও গোলাকার এবং ওঁরও ছ' দিক চেপ্টা। কচিবাবুর পিতৃদেব  
পাঁচুবাবু একদা ছ' হাতে উপার্জন করে কয়েকখানি বাড়ি বানান।  
এমন কায়দায় বানান বাড়িগুলো যে দশ পনেরো ঘর ভাড়াটে থাকতে  
পারে প্রতি বাড়িতে। তাই থাকছে। কচিবাবু প্রতিটি বাড়ির দরজার  
মাথায় টিন সঁটে দিয়েছেন। টিনের রঙ কালো, কালো রঙের ওপর  
সাদা রঙ দিয়ে লেখা আছে—গেরস্ত বাড়ি। পর পর তিনখানি গেরস্ত  
বাড়ি। লোকে বলে পাঁচুবাবুর গোয়াল। লোকে আরও কত কি  
বলে। লোকের কথায় কান দিতে গেলে বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসার  
চালানো যায় না। তা' ছাড়া কচিবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কেউ  
কিছু বলে না। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে কচিবাবুকে ঘাঁটাতে  
যাবে।

বতুলাকার কচিবাবু গড়াতে গড়াতে উপস্থিত হোয়ে ঐ ঘাঁটার  
কথাটাই আগে উত্থাপন করলেন—“দেখুন স্মার, ব্যাটারদের কাণ্ডটা  
একবার দেখুন। ভাংচি দিচ্ছে, ইতিমধ্যেই শুরু হোয়ে গেছে ভাংচি  
দেওয়া। দিদিকেই জিজ্ঞাসা করুন, দিদিই বলুক আপনার সামনে  
—কে কি বলেছে। আমি বাবা কচিরাম, কারও ভালোতেও নেই  
মন্দতেও নেই। কিন্তু আমাকে ঘাঁটালে—হঁ-হঁ—কি বলুন স্মার—  
আপনি তো দেখছেন আমাকে এতদিন। বলুন কোনও দিন কারও  
ব্যাপারে কচিরাম নাক গলাতে গেছে। আপনার নাম দিদির কাছে কে  
করেছে বলুক দিদি। আমি—এই কচিরাম—আমি বললাম দিদিকে  
আপনার কথা। বললাম—যাও দেখা করে এস। আপনার লেখা  
বইগুলোর নাম করলাম। সমস্ত পড়া হোয়ে গেছে দিদির। বিলকুল



মুখস্থ একেবারে। আর কেউ করেছে আপনার নাম দিদির কাছে ?  
মানে—পড়েছে আপনার বই যে নাম করবে ! আমি—এই কচিরাম—  
এক একখানি বই বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কিনে এনে পড়েছি। আপনি  
আমাদের কাছে থাকেন, আপনি আমাদের সম্পত্তি, আপনার বই  
কিনব না তো কি কেথাকার কে গঙ্গারামের বই কিনে পড়ব। সব  
বই আছে আমার কাছে, দেখিয়েছি দিদিকে। কেমন দিদি, দেখেছে  
কিনা বল ওঁর সামনে।”

এই ভাষণ শোনার পরেও লেখক প্রসন্ন হবেন না, এমন লেখক  
যদি কেউ থাকেন তা’হলে তিনি সাক্ষাৎ শুকদেব। আমিও প্রসন্ন না  
হোয়ে পারলাম না, এ কথাটা লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি।  
প্রসন্ন হোলেও হঠাৎ যেন গা বমিবমি করতে লাগল। স্বয়ং সাক্ষাৎ  
কচিবাবু পর্যন্ত আমার বইগুলো পড়ে ফেলেছেন জানতে পেরেই ঐ  
বমি ভাবটা হোল বোধ হয়। উপায় কি ! বই লিখলে যার খুশি  
কিনে পড়বে, বাধা দোব কেমন করে !

বাধা দিলাম ভাষণে। লাগাম না টানলে কচিবাবুর মুখ ছোটানো  
বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একান্ত ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে  
বসলাম—“আপনার মামলার কি হোল ? খবরের কাগজে দেখলাম  
দায়রা পর্যন্ত গড়িয়েছে। জামিন পেলেন কেমন করে ? এই সব  
মামলায় তো বড় একটা জামিন দেয় না।”

হাঃ হাঃ শব্দে হামতে শুরু করলেন কচিবাবু। পাতলা আঙ্গুর  
পাঞ্জাবির মধ্যে থলথলে মাংসপিণ্ডগুলো কিলবিল করতে লাগল।  
খানিক পান-জর্দার রস গড়িয়ে পড়ল ছুই কশ বেয়ে, কোঁচার খুঁট তুলে  
মুখে চেপে ধরলেন। হাসি এবং পানের পিক সামলে একান্ত গোপনীয়  
কিছু বলছেন এইভাবে গলা খাটো করে বললেন—“পাওয়া যায় স্মার,  
খুন করলেও জামিন পাওয়া যায়। আর দায়রা স্মার—ও আমার  
দেখা আছে। সব গুছিয়ে ফেলেছি, দায়রার মামলা উঠলে সেই  
ছুঁড়ির মা বাপই উলটো কথা বলবে। স্মার বয়েসটা নিয়েই আটকাচ্ছে,



ঐ চোদ্দ বছর নিয়েই লাগছে ঝামেলা। নয়ত ঐ মামলা আর দায়রায় পাঠাতে হোত না।”

কথাগুলো শুনতে শুনতে বার বার তাকিয়ে দেখলাম তুলসীর মুখ পানে। এতটুকু ভাবান্তর ঘটল বলে মনে হোল না, খুবই বোকা বনে গেলাম।

সত্যিই বোকা বনে গিয়েছিলাম। তুলসী বুঝতে পেরেছিল আমার মনের অবস্থাটা। কচিবাবু আরও কিছুক্ষণ মামলা মকদ্দমা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে চলে গেলেন। ওঁর সময়ের মূল্য আছে, ভয়ানক নামজাদা এক শ্রমিক নেতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে গেলেন। যাবার সময় তুলসীকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। সেটা তুলসীর, সন্ধ্যার পর কারা নাকি আসবে ওকে নিয়ে যাবার জন্তে, এক সভায় ওকে গান গাইতে যেতে হবে।

“এইহোল চান্স, আজ যেখানে গান গাইতে যাচ্ছ দিদি, যদি মাত্ করে আসতে পার, তা’হলে মাসে বিশটা কল বাঁধা। এই জন্তেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। দিক শ্লারা ত্রিশ টাকা আজ, এর পর নগদ একখানি বড় নোট বার করতে হবে। হুঁ-হুঁ—আমার নাম কচিরাম, দাম কি করে উঠোতে হয় নামাতে হয় তা এই শম্মার জানা আছে।”

বাণীটি শুনিয়া হস্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন কচিবাবু। সঙ্গে সঙ্গে তুলসী পরম বিজ্ঞের মত মাথা ছুলিয়ে বলল—“পাগল, আস্ত পাগল ঐ কচিবাবু। মনটা একদম ছুধের মত সাদা, একদম ছেলেমানুষের মত, যা মনে এল বলে ফেললো। তাই তো বেচারার পদে পদে বিপদ ঘটছে।”

“তা’ ঘটছে”—প্রচুর চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—  
“তা তো ঘটবেই। দেশে এখনও পুলিশ আদালত আইন ইত্যাদি

সব বাজে ঝামেলাগুলো রয়েছে কি না। কিন্তু অনবরত শ্রীমান কচি তোমায় দিদি দিদি বলছিল কেন? তোমার বয়েস তো ওর চেয়ে অনেক কম।”

“সে এক ইতিহাস”—তুলসী অতীতের গর্ভে তলিয়ে গেল। পালটে গেল গলার স্বর চোখের চাউনি, খুবই অগ্নমনস্ক হয়ে পড়ল যেন। থেমে থেমে বলতে লাগল—“তা’হলে এইটেই আগে শুনুন। তখন আমার বয়েস অনেক কম, ক্লাশ টেনে তখন উঠেছি। হাঁ, ঠিক মনে পড়েছে পরের বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম।”

“ম্যাট্রিক পাশ করেছ তুমি! কলেজেও পড়েছ নাকি?” চাপতে পারলাম না মনের ভাবটা, ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে পড়েছি বুঝতে পারল তুলসী। শ্রান একটু হেসে বললে—“চার বছর পড়েছিলাম। বি. এ. পাশ করে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। কপাল খারাপ, চাকরিটা গেল। জেল থেকে বেরিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম মনিবদের সঙ্গে। গেট থেকে দরোয়ানরা তাড়িয়ে দিলে।”

“জেল! মানে—আন্দোলন করতে বুঝি!”

ঘাড় নেড়ে তুলসী বলল—“ও সব নয়, চুরি করেছিলাম বলে সাজা হয়ে গেল।”

“চুরি করেছিলে!”

“আদালতে তাই প্রমাণ হয়েছিল।”

আদালতে প্রমাণ হয়েছিল যে চুরিটা তুলসী করেছিল। তাই বরুণ সেন ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পাওয়াটা একান্ত দরকার ছিল বরুণ সেনের। তুলসী তো রিভলবার চালাতে জানত না। বরুণ ঐ কর্মটি ভালভাবে জানত। বরুণ সেন ছোটবেলায় গুলতি দিয়ে উড়ন্ত চড়ুই মেরে বেড়াত। বড় হয়ে ম্যারীন্ এন্জিনীয়ার হোল, দুনিয়ার সাত সমুদ্র চষে বেড়াতে লাগল জাহাজের জঠরাগ্নির তোয়াজ করতে করতে। বিগড়ে যাওয়া জাহাজের বয়লার বরুণ সেনের



হাতের খাম্বড় খেয়েই নাকি সিধে হোয়ে যেত। ওর পেশা ছিল বয়লার আর নেশা ছিল বন্দুক রিভলবার রাইফেল নিয়ে খেলা করা। ঐ মারাত্মক খেলাটা এমন ভাবেই রপ্ত করেছিল বরুণ সেন যে তুলসীকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে একে একে চারটে ছশমনকেই সোজা শমন সদনে রওয়ানা করিয়েছিল। সংবাদগুলো তুলসী জেলের মধ্যে বসেই পায়। পায় বলেই হাসি মুখে দেড় বছর জেল খেটে আসতে পেরেছে। কিন্তু তারপর!

খেই হারিয়ে গেল যেন, তারপর কি বলতে হবে তা' যেন হঠাৎ ও ভুলে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম, বিভ্রান্ত হোয়ে পড়েছে। মনে হোল সেই ছোট্ট মেয়েটার কথা যে দাদার হাত ধরে চলছিল মেলার মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে হাত ফসকে গেল, আর মেয়েটা ভেবাচাকা খেয়ে কেঁদে উঠল। সেই ছোট্ট মেয়েটার কথাই মনে পড়ে গেল আমার। ভয়ানক রকম বিব্রত হোয়ে পড়লাম, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করা যায়!

অনেকগুলো প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করতে লাগল মনের মধ্যে। কে সেই ম্যারীন্ এন্জিনীয়ার বরুণ সেন! চার চারটে ছশমন—যাদের বরুণ সেন শমন সদনে পাঠিয়েছে, তারাই বা কারা! তারপর ঐ চুরি, কার কি চুরি গিয়েছিল যার দরুণ দেড় বছর জেল খাটতে হোয়েছিল তুলসীকে! আরও বহু জাতের বহু প্রশ্ন দল বেঁধে নাচতে লাগল সামনে, অতি কষ্টে গুম হোয়ে বসে রইলাম। হারিয়ে যাওয়া মেয়েটাও পাথরের মত বসে রইল সামনে। ঠিক বুঝতে পারলাম, খোসাটাই শুধু বসে রয়েছে, খোলসের ভেতরে যে থাকে সে পাড়ি দিয়েছে সাত সমুদ্রের বুকে। খুঁজেছে, জাহাজে জাহাজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বলা তো যায় না, সেই ম্যারীন্ এন্জিনীয়ার বরুণ সেন হয়তো কোনও জাহাজের খোলে বয়লার সেবা করতে করতে মশগুল হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলা তো যায় না—

“বলা যায় না, কার ভেতর কি আছে কিছুই বলা যায় না।” অনেকক্ষণ বাদে আবার শুরু করলো তুলসী। স্বপ্ন দেখছিল যেন, স্বপ্নটা ভেঙে যেতে চমকে উঠে খেই হারানো কাহিনীটার অণু একটা জায়গা থেকে বলতে শুরু করলো।

“তখন আমার বয়েস অনেক কম, ঐ কচির বয়েসও তখন অনেক কম। পাঁচুবাবু তখন বেঁচে ছিলেন। মস্ত বড় ঠিকাদার ছিলেন পাঁচুবাবু, জঙ্গল ঠিকা নিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতেন। অনেকগুলো লরি অনেক লোকজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি, তাঁবু-টাঁবু সব সঙ্গে থাকত। আমার মামা ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন। সেবার আমার কাছে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।”

বাকীটুকু বুঝে নিলাম আমি। কচিরামের সঙ্গে পরিচয় হয় তুলসীর সেই ফরেষ্টেই। ফরেষ্টটা কোথায় তা জেনে আমার লাভ কি। কচিরাম তখন কেমন ছিল, কি করত, এমন কি ঘটেছিল যার দরুণ তুলসী বুঝতে পেরেছিল যে কচিরামের মনটি একেবারে দুধের মত সাদা, এই সমস্তই আমার জানা দরকার। জিজ্ঞাসা করতে হোল না কিছুই, তুলসী সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে লাগল—“তখন ও কি রকম রোগা ছিল, আন্দাজ করতেও পারবেন না। একদম খ্যাংরা কাঠি, সবাই ওকে ফড়িং বলে ডাকত। আমার মামা বলতেন গঙ্গাফড়িং। আর তেমনি ছিল ভীতু, দিনরাত বাপের তাঁবুর কাছে কাছে আছে। জঙ্গলে নাকি বাঘ ভাল্লুক সাপ ভূত পেত্নীরা হাঁ করে সব বসে থাকে, ধরতে পারলেই টপ করে গিলে খাবে।

সেই খ্যাংরা কাঠি মার্কি কচি কি করল জানেন, একলা ছোটো মাতাল সাহেবকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছাড়লে। হুকুম না নিয়ে শিকার করতে এসেছিল তারা, ফরেষ্ট অফিসের লোকে ধরে ফেলেছিল। সাহেবদের মেজাজ বিগড়ে গেল। বন্দুক চালাতে লাগল এলোপাতাড়ি! মামা তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়লেন। ফরেষ্ট অফিসেও বন্দুক-টন্দুক থাকে। কিন্তু চালাবে কে। আসল লালমুখো সাহেব, কে



জানে কোন লাটসাহেবের ভায়রাভাই হয়তো হবেন ওঁরা, সুতরাং ভাগল সবাই। আমার মা আমি আর ছেলেমেয়ে নিয়ে মামীমা বেচারী, আমরা পালাতে পারলাম না। সাহেব দু'জন তখন বাসার সামনে এসে পড়েছে। হংকার ছাড়েছে তারা, আর সমানে গুলি ছুঁড়েছে। দু'চারটে বুলেট বাসার ভেতরে ঢুকল। দেওয়াল ছেঁদা করে একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের অবস্থা তখন কেমন বুঝুন। ঘরের মেঝেয় সবাই উপুড় হয়ে পড়ে আছি। আর ভাবছি, এই বুঝি দরজা ভেঙে ঢুকল ওরা ভেতরে।

হঠাৎ এক কিস্তুতকিমাকার আওয়াজ করে উঠল বাইরে। দশ বিশটা মোষ যেন এক সঙ্গে চৈঁচিয়ে উঠল। তারপরই কে যেন অস্তিম আর্তনাদ শুরু করলো। জাঁতায় ফেলে পিষলে মানুষ বোধ হয় ঐ ভাবে চৈঁচায়, তুলকালাম ব্যাপার যাকে বলে, ওধারে সেই দশ বিশটা মোষ একসঙ্গে চৈঁচাচ্ছে আর তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে মানুষের গলা। মানুষটাকে যে পিষে মারা হচ্ছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মামীমা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চৈঁচিয়ে উঠলেন—“ও সেই ঠিকাদারের হাতি! হাতিটা ফেপে গেছে নিশ্চয়ই। কি সর্বনাশ, বাসা তো ভেঙে ফেলবে।”

পালাও পালাও, শিগগির বাসা থেকে বেরিয়ে পড় সবাই, নয়ত ঘর চাপা পড়ে মরতে হবে।

বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সাহেবে মারলেও মারবে, ঘর চাপা পড়লেও মরব, দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সবাই। বেরিয়েই যে দৃশ্য দেখলাম—”

জুড়ে দিলে হাসি—হি হি হি হি। হাসি চাপবার জন্যে আঁচল তুলে মুখে চেপে ধরল।

হাসি থামবার পর গুনলাম। শ্রীমান কচিরাম একলা ছিল ওর বাবার তাঁবুর কাছে, পাঁচুবাবু লোকজন নিয়ে গাছ কাটাতে গিয়েছিলেন। হাতিটাকে নিয়ে যাননি, পায়ে চেন বাঁধা সেটা দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। কচিরাম চেন খুলে দিয়ে উপস্থিত হোল সাহেবদের পেছনে। হাতিটা ওর কথা বুঝত। ছোট বেলা থেকে ওকে পিঠে করে বেড়িয়েছে। কচিরাম হাতির কানে কানে বলে দিলে কি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে হংকার দিয়ে উঠল। হঠাৎ পেছনে সাক্ষাৎ যমকে দেখে সাহেবদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে তখন, রাইফেল খসে পড়েছে হাত থেকে। তেড়ে গিয়ে হাতি একটা সাহেবকে শুঁড়ে জড়িয়ে উঁচু করে ধরে রইল। মরণ চেষ্টান চেষ্টাতে লাগল লোকটা, আর একজন তখন উধাও হয়েছে। খ্যাংরা কাঠি মার্কি কচিরাম তখন রাইফেল ছুটো তুলে নিয়ে হাতির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

তারপর থেকে ও আমাকে দিদি বলে ডাকে। ওর মা নেই তো, ছোট বেলায় তিনি মারা গেছেন। পাঁচুবাবু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ ব্যাপারটার পরে আমার মাকে বললেন ছেলেটার ভার নিতে। কচি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল। মা যতদিন ছিলেন ততদিন ওকে ছাড়েননি। মা বলতেন, আমার একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। ঠিক নিজের ছেলের মত দেখতেন ওকে, কচিও আমার মাকে নিজের মা বলে মনে করত। তারপর সব উলটো পালটা হয়ে গেল। মা মারা গেলেন, পাঁচুবাবুও মারা গেলেন। কচি বাপের সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্তে চলে এল।”

মুখ লুয়িয়ে একটু চিন্তা করে আবার আরম্ভ করলো তুলসী—  
কিন্তু মনটা ওর সাদা, ছুধের মত সাদা। যা মুখে এল বলে ফেললে, এইটে হচ্ছে সব চেয়ে বড় দোষ ওর। নয়ত ওর মত মানুষ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।”

হয়তো তাই ঠিক। ওপরটা দেখে ভেতরটা বোঝবার উপায় নেই, এমন মানুষ ছুনিয়ায় এস্তার আছে। শ্রীকচিরামবাবুর মনে যা উদয় হয় তা উনি সঙ্গে সঙ্গে উগরে ফেলেন, এটা আমারও



জানা আছে। একবার ভয়ানক গণ্যমান্ত এক আবকারী হুজুর এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক দেশপূজ্য নেতা। একটা ছোটখাট সভার মত হোল। ওঁরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে মদ্যপান ব্যাপারটা কতখানি খারাপ। বিশেষতঃ চোলাই মদ যা ব্লাডারের মধ্যে ভরে বাজারে আসে, যাতে সরকারের ছাপ থাকে না, সেই মদ খাওয়াটা শুধুই যে বেআইনী তা নয়। ও খেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবার সম্ভাবনাও খুব বেশী। কারণ চোলাই করবার সময় নাকি ওতে কার্বাইড্ অফ্ ক্যালসিয়াম দেওয়া হয়।

অনেক ভাল ভাল কথা বললেন ওঁরা, মুখ টিপে আমরা শুনতে লাগলাম। কে ডেকেছিল কচিবাবুকে জানি না। এ রকম সভায় ওঁকে কেউ ডাকে না। ভাগ্যক্রমে উনি সেখানে ছিলেন। ইঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, কয়েকটা কথা বলতে পারেন কি না।

“হাঁ হাঁ বলুন বলুন, যা কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।” নেতা মশাই কচিবাবুকে উৎসাহ দিলেন।

কচি শুরু করল —“আমরা জানি, সরকার এখনও মদ খাওয়াটা বেআইনী করেনি। আমরা জানি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে কতকগুলো মদের দোকান চলছে। কিন্তু সেখানে যদি মদ পাওয়া না যায়, তাহলে যারা মদ খায় তারা যাবে কোথায়? মদ বলে যে পদার্থ বোতলে ভরতি হয়ে দোকানে দোকানে বিক্রি হচ্ছে, তাতে কি আছে পরীক্ষা করে দেখুন। পয়সা খরচ করে কেন লোকে জল কিনতে যাবে। বাধ্য হয়েছে তাই মাতালকে ঐ চোলাই মদের সন্ধান করতে হয়। আজ থেকে সরকারী লাইসেন্সওয়ালা দোকানে সত্যিকারের মদ বিক্রি শুরু হোক। দেখা যাবে, চোলাই মদের কারবার একদম উঠে গেছে। চেষ্টা করলে, এক টাকার জায়গায় দু'টাকা দাম দিলে খাঁটি দুধ হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু ঐ বেআইনী ব্লাডারে ভরতি বিষ দিয়ে চোলাই করা মদ যিনি না কিনবেন তিনি দশ টাকা দিলেও সরকারের ছাপ মারা দোকান থেকে

এক বোতল খাঁটী মদ পাবেন না। মুশকিল হচ্ছে, মাতালরা মদে জল মেশানো হচ্ছে বলে সভা সমিতি করে আন্দোলন করতে পারে না। তাই আমার অনুরোধ, হয় সরকার মত্তপান নিষিদ্ধ করে দিন একে-বারে কিংবা সত্যিকারের মদ বেচার ব্যবস্থা করুন।”

সাদা প্রাণের সাদা কথা বললেন কচিবাবু। অবকারী ছজুর আর নেতা মশাই জবাবই দিলেননা। ফল হোল কিন্তু সাংঘাতিক, মাসে দু'বার পাঁচুবাবুর বাড়ীগুলোতে আবকারী দারোগা হামলা চালাতে লাগলেন। মুঠো মুঠো টাকা গচ্ছা দিলেন কচিবাবু। সরকারী ছজুরদের কি ঘাঁটাতে আছে!

তুলসী কিন্তু আর এক কাহিনী শোনালো। কচিবাবু যে কতখানি সাদা প্রাণ সাদা মনের অধিকারী এটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে ছাড়লে।

“জেল হোয়ে গেল। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে জেলে এটা ভাবতেই পারিনি। মাস দুই পরে হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার ছোট ভাই দেখা করতে এসেছে। ছোট ভাই! আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম, ছোট ভাই আবার কে এল! ছোট ভাই বড় ভাই কাকা মামা তিন কুলে কেউ নেই আমার, যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ দেখা করতে আসবেন জেলে, এ যে কল্পনাও করা যায় না। জেল গেটে এসে দেখি কচি। বহু রকমের তদবির তদারক করে বোনের সঙ্গে দেখা করার হুকুম পেয়েছে। তারপর জেলে আমার খাতির যত্ন বেড়ে গেল। স্বয়ং জেলার পর্যন্ত সংবাদ নিতে লাগলেন আমার, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, কেউ জ্বালাতন করছে কি না, সব তার জানা চাই। মায় তেল সাবান মশারি পর্যন্ত দেওয়া হলো আমাকে। সহজ কথা নয়, সান্ধাৎ কচিবাবুর দিদি আমি, আমাকে খাতির না করলে বিপদ ঘটবে যে।”

“বিপদ!” আশ্চর্য হোয়ে গেলাম।



তুলসী বলল—“বিপদ বই কি। জেল থেকে বেরিয়ে বুঝতে পারলাম বিপদটা কি। দিদি যতদিন জেলে ছিল ততদিন ঐ কচি মাসে মাসে মোটা রকম মাসোহারা দিয়েছে জেলওয়ালাদের। বিনা পয়সায় কি চিঁড়ে ভেজে। পাছে কচিবাবুর দিদিকে কেউ অসম্মান করে ঐ ভয়ে হাজার পাঁচেক খরচা করেছেন কচিবাবু। পাঁচ হাজার টাকা রোজগার না হওয়াটা ওঁদের পক্ষে কি কম বিপদের কথা।”

এতক্ষণ পরে আবার আসল কথা এসে গেল। কচিবাবুর পরিচয় আর কাঁহাতক শোনা যায়। সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—“জেলটা যে কেন হয়েছিল তোমার তা তো বললে না। আপত্তি যদি না থাকে—”

তুলসী বেশ মিয়িয়ে পড়ল যেন। চেষ্টা করে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলে—“বলছি, সবই বলছি। কিছুই আপনার কাছে লুকবো না।”

ঐ কথাটি বলা সহজ, কিছুই না লুকিয়ে সবই বলা কিন্তু দস্তুরমত শক্ত কাজ। শক্ত কাজ না বলে বলা উচিত—অসাধ্য ব্যাপার। ইচ্ছে করে বা চেষ্টা করে কিছুই লুকোতে চায়নি তুলসী, অকপটে সব কিছুই নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিল। জেরা করলে হয়তো বলেও ফেলত। কিন্তু জেরা তো করিনি আমি, মুখ টিপে আগাগোড়া শুনেছি আর বুঝে নিয়েছি। শব্দের আকারে যা ঢুকেছে আমার কানে তার চেয়ে অনেক বেশী টের পেয়েছে আমার চোখ ছটো। তাই হয়তো পারব, প্রকৃত ব্যাপারটা যথাযথ ফুটিয়ে তোলা হয়তো সম্ভব হবে। চোখ বুজে শ্রেফ কান দিয়ে শুনতাম যদি তা’হলে নিশ্চয়ই ভুল হোত, নির্ধাৎ সব ঘুলিয়ে ফেলতাম। যেমন তুলসী নিজেই বার বার ঘুলিয়ে ফেলেছিল, একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা বলে তারপর নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে শুধরে নিচ্ছিল।

ঐ রকম ভুল হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, না হওয়াটাই সন্দেহজনক। নিখোঁ কথ্য মুখস্ত করে আসত যদি তা’হলে

মোটাই ঘুলিয়ে ফেলত না। ঘটনাগুলো সত্যি, বৃকের মধ্যে দাগ কেটে বসেছে এমন সব ঘটনাগুলোর বিষ বা অমৃত মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে। ফলে উৎকট একটা নেশার ঘোরে শোনাচ্ছে নিজের কাহিনী। শোনাতে শোনাতে নেশাটা চড়ে যাচ্ছে, সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলছে। এইটেই স্বাভাবিক ব্যাপার, নিজের কাহিনী অকপটে সমস্ত শোনানো সত্যিই অসাধ্য সাধন, ঘুলিয়ে যাবেই।

“বি, এ পাশ করবার পর বুঝতে পারলাম যে তখনই একটা চাকরি চাই। চাকরি করব এই আশায় মামা পড়বার খরচা চালাচ্ছিলেন। আমাকে রোজগার করতে হবে, যা রোজগার করব তাতে আমার আর মায়ের বেঁচে থাকাটা চলবে। চিরকাল মামা আমাদের খরচা চালাবেন কেন, তাঁরও ছেলে মেয়ে আছে। দরখাস্ত পাঠাতে লাগলাম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটার পর একটা দরখাস্ত করছি। হঠাৎ একখানা দরখাস্তের জবাব এল। চাকরি হয়ে গেছে, খাওয়া থাকা ফ্রি, নগদ একশ’ পঞ্চাশ টাকা মাইনে। সাত দিনের মধ্যে কাজে বোগ দিতে হবে। মা বেঁকে বসল, একলা মেয়েকে অতদূরে কিছুতেই যেতে দেবে না। মামা এসে বুঝিয়ে স্তুজিয়ে মাকে নিয়ে গেলেন। আমিও রওয়ানা হোলাম।”

এটুকু বলে একদম চুপ, বেশ কয়েকটি মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর খুব সন্তুর্পণে প্রায় চুপি চুপি উচ্চারণ করল—“আর আমি মাকে দেখিনি।”

ঘুলিয়ে গেল। কোথায় গেল চাকরি করতে সেইটে আগে বলা উচিত ছিল। ঘুলিয়ে ফেললে। নিজের কাহিনী শোনাচ্ছে যে, তাই চট করে মনে পড়ে গেল নিজের মায়ের কথা, যে মাকে রোজগার করে খাওয়াবে বলে রওয়ানা হয়েছিল চাকরি করতে এবং যে মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এ রকম অবস্থায় আমিই বা কেমন করে জেরা



করি ! আমিও সব ঘুলিয়ে ফেললাম, কোথায় গিয়েছিল চাকরিটা করতে এই প্রশ্নটা করতেই পারলাম না।

এমনি ভাবে গুলিয়েছিল আমাকে সমস্ত তুলসী। জানতে পেরেছিলাম আমি সবই। কতকটা কানে শুনে কতকটা চোখে দেখে প্রায় সবই বুঝে ফেলেছিলাম। তবু এই কাহিনীটি কেমন যেন খাপছাড়া গোছের হবে। যেমন যে জায়গায় চাকরি করতে গিয়েছিল তুলসী সে জায়গাটার নামটি সে শোনায়নি। আমিও জিজ্ঞাসা করে জেনে নিইনি। জায়গাটা নাকি এই বাঙলা দেশেরই পাহাড়ী অঞ্চল। রেল স্টেশন থেকে পনেরো মাইল যেতে হয় মোষের গাড়ি চড়ে। কপাল ভাল হোলে একাও মেলে। একাতে যাওয়া কিন্তু উচিত নয়, একার ওপর বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে হাড়গোড় ভাঙবার উপক্রম হয়। তুলসীকে অবশ্য মোষের গাড়ি বা একায় চাপতে হয়নি, মনিব একটা ছোট হাতি পাঠিয়েছিলেন স্টেশনে। হাতির পিঠে গদি বাঁধা ছিল। গদির ওপর বসে ছলতে ছলতে হাজির হয়েছিল তুলসী চাকরি করতে। এর নামই হোলো কপাল, হঠাৎ একেবারে রাজার ঘরে গিয়ে উঠল হাতির পিঠে চেপে, আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাত স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু কপালেরও এপিঠ ওপিঠ আছে, এপিঠের লেখার সঙ্গে ওপিঠের লেখা একদম মেলে না। তাই কপালের উলটো পিঠের লেখাটা যখন ফলতে শুরু করল তখন দেখা গেল, তুলসীকে সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে আসতে হচ্ছে স্টেশনে। যান একখানি সাইকেল। সাইকেলে চেপে একদিন সকালে চলে এল স্টেশনে, ট্রেনে চেপেও বসল। তারপর ধরা পড়ল।

“তাহলে সাইকেল চাপতেও জান তুমি !” অনেকক্ষণ পরে ফাঁক পেয়ে ঐ প্রশ্নটি করেছিলাম।

খুবই উত্তেজিত হয়ে ও গুলিয়ে দিলে—“শুধু সাইকেল কেন,

আরও অনেক কিছু পারি। সাইকেল চাপতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি, টাইপ করতে পারি ঝড়ের মত, আর গান তো আপনি শুনেছেনই। সমস্তই ওখানে চাকরি করতে গিয়ে শিখে ফেলতে হোল। মনিব বললেন—সব শিখে নাও দিদিভাই, যা শিখবে তাই কাজে লাগবে। কি করব, সারা দিন রাত ঐ সব নিয়েই থাকতাম, কাজ তো কিছুই ছিল না। খাও দাও আর ঘুমিয়ে পড়। কাঁহাতক আর ঘুমতে পারে মানুষ, তাই ঐ সমস্ত নিয়েই মেতে থাকতাম।”

“শুধু শুধু দেড়শ টাকা মাইনে দিয়ে তাঁরা তোমায় রেখেছিলেন কেন?” এই প্রশ্নটি না করে থাকতে পারলাম না।

“বড়মানুষের খেয়াল বলতে পারেন।” জবাবটি যেন খুবই তাম্বিল্য ভরে দিল তুলসী। দিয়েই সজাগ হয়ে পড়ল ষোল আনা। সঙ্গে সঙ্গে ওর হুই ভুরুর মাঝখানে তিনটি দাগ দেখা গেল। আমার চোখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন আন্দাজ করে নিয়ে বললে—“কোনও কিছু আজোবাজে ধারণা করবেন না তা বলে। বই লেখেন তো, তাই আমার বড় ভয় আপনাকে। মনে মনে হয়তো এমন একটা কিছু ধারণা করে বসবেন যা পড়লে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ঐ সব গল্প উপস্থাসের ব্যাপার একদম নেই আমার জীবনীতে। যিনি আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন তাঁর বয়েস তখন প্রায় আশি। জ্ঞানপ্রকাশ সেন তাঁর নাম। যাঁরা ওঁকে চিনতেন তাঁরা এখনও ওঁর নাম শুনলে মাথা নোয়ান।”

আমিও নোয়ালাম। কারণ গল্প উপস্থাস লেখা আমার পেশা, তাই মনটা একদম আস্ত আস্তাকুড়। আশি বছরের জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশাই বি, এ পাশ করা এক যুবতীকে দেড়শ টাকা মাইনে দিয়ে কি কাজ করবার জন্তে নিযুক্ত করেছিলেন, সেটা আন্দাজ করতে গিয়ে নিজে থেকেই আমার মাথাটা লুয়ে পড়ল।

জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশাই কিন্তু জীবনে কারও কাছে মাথা



নোয়াননি। ভয়ঙ্কর রকম বড়মানুষ ছিলেন তিনি, নিজে রোজগার করে বড়মানুষ হয়েছিলেন। ইংরেজরা যখন এ দেশে ছিল তখন নামজাদা এক ইংরেজ কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন সেন মশাই। তার ওপর নিজে এক কোম্পানী খুলে জাহাজ জাহাজ মাল পাঠাতেন বিলেতে। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল করল। কেন করল, কার দোষে করল, তা নিয়ে গবেষণা না করে আমানতকারীদের পাই পয়সা ফেরত দেন জ্ঞানপ্রকাশ। দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সমাজ সংসার ত্যাগ করে চলে যান সেই পাহাড়ী জায়গাটিতে, লোকালয় থেকে অনেক তফাতে প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়ি কিনে প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। জীবনের শেষ দিনগুলো শান্তিতে কাটাবার বাসনায় মনের মত কয়েকটি লোককে সঙ্গে রেখেছিলেন। ওঁর আপন জনেরা কেউ যেতে পারত না সেখানে, পুত্ররা পুত্রবধূরা নাতি নাতনী মেয়ে জামাইরা একদিনের জন্তে যেতে পায়নি ওঁর কাছে, যতক্ষণ ওঁর জ্ঞান ছিল ততক্ষণ পারেনি। যখন উনি শেষশয্যা গ্রহণ করলেন, তখন শচী সবাইকে তার করে দিল। তার পেয়েই চলে এল সকলে। এসে দেখল, উনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঠিক পনেরো দিন এক ভাবে চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ, পনেরো দিনে একটি কথাও কারও সঙ্গে বলেননি। ষোল দিনের ভোরে একটি বার মাত্র চোখ মেলেছিলেন, মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন ছ'বার, তারপর মহাপ্রয়াণ। হাঁ, সত্যিকারের মহাপ্রয়াণ যাকে বলে তাই করেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ সেন। মরা কর্মটিকে যতখানি মর্যাদার সঙ্গে সুসম্পন্ন করা যায়—

ইংরেজ কোম্পানীর বেনিয়ান জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের গৌরবান্বিত জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে শুনতে শুনতে ধৈর্যের চরম সীমায় পৌঁছেছি যখন তখন শুনলাম একটি চমকপ্রদ বৃত্তান্ত।

“হবে না কেন বলুন। মরণকে তো উনি ভয় করতেন না,

মরণের পরে কোথায় যাবেন কি অবস্থায় থাকবেন সমস্ত জানতেন কিনা। যাঁরা মরে গেছেন তাঁদের সঙ্গে হরদম আলাপ আলোচনা করতেন। বহুবার দেহ থেকে বেরিয়ে গেছেন মহাপুরুষদের সঙ্গে, গিয়ে পরলোকের সব ব্যাপার স্থাপার দেখে এসেছেন। মরণকে উনি ভয় করবেন কেন।”—এইটুকু বলেই থেমে গেল তুলসী। থেমে গেল মানে হঠাৎ কেউ ওর মুখ চেপে ধরল যেন। ভয়ানক সন্ত্রস্ত ভাবে বার বার এধার ওধার তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। আমি আর ও ছাড়া অণু কেউ যেন রয়েছে আশেপাশে। লক্ষ্য করতে লাগলাম ওর হাবভাব, লক্ষ্য করতে করতে বুঝতে পারলাম আমারও গা ছমছম করছে। স্পষ্ট টের পেলাম, অদৃশ্য অবস্থায় কেউ যেন উপস্থিত হয়েছে, হোয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা গুনছে।

অল্প সময় পরেই তুলসী সামলে গেল। খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—“দেখুন, কি বলতে কি বলছি আপনার কাছে। কেন জেল খাটতে হল আমাকে শোনাতে গিয়ে আজ বাজে বকে মরছি। জেল খাটতে হোল বরুণ সেনের জন্তে। আমি যদি জেল না খাটতাম তাহলে ওকেই খাটতে হোত। তার ফল হোত এই, যারা ওর দাছর সঙ্গে ছুশমনি করেছিল তারা পার পেয়ে যেতো। সেটা আমি হোতে দিইনি।”

“তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিছিমিছি অপরের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে তুমি জেল খেটেছ।” বলে ব্যাপারটাকে সোজা রাস্তায় আনতে চাইলাম আমি। ফল হোল উলটো, অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হোয়ে উঠল তুলসী। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল “না না, যা ভাবছেন মোটেই তা নয়। বরুণ চুরি করেনি, আমি চুরি করিনি, চুরি মোটে হয়ইনি। সবটাই সাজানো ব্যাপার, সমস্তই সেই শয়তানদের শয়তানী কাণ্ডকারখানা। কি মতলব করেছিল তারা তা একমাত্র আমিই জানতে পারি। আমিই জানতে পারি শয়তানদের



নাম ধাম পরিচয়। দাছ আমাকে জানিয়ে দেন। বেঁচে যতদিন ছিলেন ততদিন একটি কথা কাউকে বলেননি। তার কারণ বেঁচে যতদিন ছিলেন ততদিন তাদের কাণ্ডকারখানা দাছও জানতে পারেননি। মরবার পরে সমস্ত জানতে পারলেন। তারপর তাদের ওপর নজর রাখতে রাখতে বুঝতে পারলেন আরও কতখানি সর্বনাশ করার জন্তে তারা মতলব আঁটছে। তখন আমাকে সমস্ত বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বরুণকে লাগালাম তাদের পেছনে। প্রথমে ও বিশ্বাস করতেই চায়নি আমার কথা, তারপর একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে লাগল যা আমি আগেই ওকে শুনিয়েছি। তখন ওর বিশ্বাস হোল। শেষকালে চরম সর্বনাশটা যখন করে ফেললে তারা, তখন ও ফেপে উঠল। কিন্তু নিজেই তখন জড়িয়ে পড়েছে জালে, জাল থেকে উদ্ধার পেলে তো প্রতিশোধ নেবে। ঐটুকুই করলাম আমি, এমন ভাবে কতকগুলো প্রমাণ সাজিয়ে রাখলাম যে দোষটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। চলে গেলাম জেলে, বরুণকে তারা আটকাতে পারল না। ফল হাতে হাতে পেল।”

এইবার সত্যি সত্যিই জট পাকিয়ে গেল আগাগোড়া। ইহলোক পরলোক মিলেমিশে জগাখিচুড়ি গোছের হয়ে দাঁড়াল। বোবা হয়ে গেলাম। মৃত্যুর পরে জ্ঞানপ্রকাশ সেন ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন! তার মানে ভূত হয়েও সেন মশাই ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছেন! এই সব বিশ্বাস করতে গেলে—

কি ভাবে যে ও মনের ভাবটা বুঝে নিত, সেইটেই এক তাজ্জব ব্যাপার। অল্প হেসে পরম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—“ইহলোক পরলোক আপনি বিশ্বাস করেন না দেখছি। আমিও ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতাম না কখনও। দাছর কাছে গিয়ে দাছর সঙ্গে কাজ করতে করতে—”

“তার মানে! তোমাকে মিডিয়াম করে জ্ঞানপ্রকাশ সেন প্রেতচর্চা চালাতেন বুঝি!”

“ঐ জন্মেই তো আমাকে অত টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে না পেলে অতটা উন্নতি উনি করতে পারতেন না। অত তাড়াতাড়ি দেহত্যাগ করবেন, এটা বোধ হয় উনি নিজেও জানতে পারেননি। কিম্বা—”

মাথা হেঁট করে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। শেষে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—“কিম্বা এও হয়তো হোতে পারে যে শরীরের ভেতর থাকার দরুণ ওঁর দুশমনদের সমস্ত মতলব জানতে পারছিলেন না। তাই তাড়াতাড়ি দেহ ছেড়ে বিদেহ হোলেন। তারপর আমাকে সমস্ত জানিয়ে ওঁদের শায়েস্তা করলেন। সবই সম্ভব, সবই সম্ভব। দেহটা ছাড়তে পারলে সব কিছু দেখা যায়, সব কিছু জানা যায়। কিন্তু কোথায় আছে এখন ওঁর নাতি, তা কি উনি জানতে পারছেন না! জানতে নিশ্চয়ই পারছেন, বলবেন না আমাকে। কেন বলবেন, দেড় শ’ টাকা মাইনের ঝি আর্মি, শুধুই মাইনে নেওয়া ঝি, ঝি ছাড়া আর কিছুই নই। কিছুই—”

বক্তব্যের শেষটুকু জড়িয়ে মড়িয়ে ক্রমেই অস্পষ্ট হোয়ে পড়ল।

যে আত্মকাহিনী শোনাতে চায়, তাকে হোতে হবে চরম নৈর্ব্যক্তিক। আবেগ উত্তেজনা ষোল আনা বর্জন করে শ্রেফ শুনিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো, কোন ঘটনাটি কি ভাবে ঘটেছিল সেইটুকুই বর্ণনা করা, কেন ঘটেছিল তাও না বলা, এইগুলিই হচ্ছে খাদ বিহীন আত্মকাহিনীর প্রধান গুণ। তুলসী তা’ পারেনি। বার বার ধরা পড়ে যাচ্ছিল। জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের নাতি বরুণ সেন যতবার আসছিল ওর কাহিনীতে ততবার সমস্ত এলোমেলো হোয়ে যাচ্ছিল যেন। অমার্জনীয় অপরাধ, আত্মকাহিনী শোনাতে শোনাতে নিজেই এক ঘটি চোখের জল ফেলা বা আনন্দে উত্তেজনায় রাগে ঘুণায় দিশা-



হারা হোয়ে পড়া অমার্জনীয় অপরাধই নয় শুধু, ওটার আর এক নাম আত্মপীড়ন। শুধু শুধু অন্তরের আগুনে দন্ধে মরে লাভ কি, তার চেয়ে আত্মকাহিনী না শোনানোই ভাল।

“তোমার যদি কষ্ট হয় তা’হলে না হয় নাই শোনালে।” খুবই বিচলিত হোয়ে পরামর্শটি দিতে গেলাম। চমকে উঠে আমার চোখের পানে তাকিয়ে বলল—“না না, কষ্ট হবে কেন। কিন্তু আপনার যদি ভাল না লাগে তা’হলে না হয়—”

চুপ করে রইলাম। ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারই নয়, উচিৎ অনুচিতের প্রশ্ন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কতখানি কষ্ট পাচ্ছে ও নিজের কাহিনী শোনাতে, উচিৎ হচ্ছে কি আমার শোনা! কি লাভ হবে আমার শুনে! খামকা কেন বেচারীকে ভোগাচ্ছি!

বিশ্বসংসারটা চলছে কতকগুলো বেয়াড়া আইনকানুনের অধীন হোয়ে, তাই ও শোনাবেই। কাঁটা সূদ্ধ ঘাস লতাপতা চিবোতে জিভ কেটে রক্ত ঝরে, তবু উট কাঁটা গাছ চিবোবেই।

“ব্যাপারটা কি জানেন” সামলে স্তম্ভে গুছিয়ে বসে শুরু করল আবার—“চুরি করেছি, জেল খেটেছি, দাগী হোয়ে পড়েছি, এর জন্তে দুঃখ করি না। এর চেয়ে ঢের বেশী বদনাম একটা ঘাড়ে করে বেঁচে আছি যে, তার কি হবে! বরুণের বাবা মা ভাইবোনেরা কাকা-কাকীরা সবাই আমাকে দায়ী করছেন। বরুণ যে উধাও হোয়েছে সে জন্তে আমি দায়ী। এই দায়টা ঘাড় থেকে নামলে হাঁক ছেড়ে বাঁচতাম। ওঁদের কাছে কিছুই যে আমি বলতে পারছি না। যদি বলি তা’হলে এখনই ওঁদের সোনার সংসার ছারখার হোয়ে যাবে! যে ভাবে উধাও হোয়েছে বরুণ সেই ভাবে অনেকেই উধাও হবেন। শচী তো বেঁচে রয়েছে, তাকেই ওঁরা জিজ্ঞাসা করুন না কেন। ইচ্ছে হয় শচী বলুক। আমি কেন বলতে যাব? কেন আমি বেইমানি করব দাছর সঙ্গে?”

এতক্ষণ পরে সোজামুজি একটা প্রশ্ন করলাম—“শচী কে?”

“শচী কে, কি সম্বন্ধ ছিল শচীর সঙ্গে দাছর, এইটুকুই আসল কথা।  
আচ্ছা দাঁড়ান, প্রথম থেকে পর পর আপনাকে সব বলে যাচ্ছি।  
তা হলেই বুঝতে পারবেন শচীর পরিচয়। চাকরি করতে গিয়েছিলাম  
যে দিন ওখানে তারপর থেকে একে একে সব বলব। মাঝখান থেকে  
খানিক খানিক বলছি বলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা  
শুনুন তা’হলে।

যেদিন আমি পৌঁছলাম ওখানে—”

এবার আপনাদের গুছিয়ে শোনাচ্ছি। যে ভাবে ও বলেছিল  
সেইভাবে শোনাতে গেলে কোনও কালে শোনানো শেষ হবে না।  
মাঝখান থেকে বিনকুল জট পাকিয়ে যাবে। সত্যিই ব্যাপারটি  
সাংঘাতিক জটিল, জটিল ঠিক নয়, কতকটা বাবুই পাখীর বাসার মত,  
আগাগোড়া টানা পড়েন দিয়ে ঠাসা বোনা। সুতরাং এবার আমাকে  
বুনতে বুনতে আস্ত কাহিনীটা খাড়া করতে হবে।

এই কাহিনীর মূল শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের বিচিত্র জীবন।  
সেন মশায়ের তিন ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ প্রীতিপ্রকাশ আর  
হ্যুতিপ্রকাশ। তিন ছেলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বড় ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ  
মস্ত বড় ব্যাক্সের এজেন্ট। মেজ প্রীতিপ্রকাশ বিদেশে ডিপ্লোম্যাটিক্  
সার্ভিসে আছেন। ছোট ছেলে হ্যুতিপ্রকাশ নাম করা ডাক্তার, মস্ত  
বড় এক হাসপাতাল চালান। জ্যোতিপ্রকাশ প্রীতিপ্রকাশ বিয়ে  
করেছেন, হ্যুতিপ্রকাশ করেননি। জ্যোতিপ্রকাশের বড় ছেলের  
নাম বরুণ, বরুণের একটি বোন একটি ভাই আছে। প্রীতিপ্রকাশের  
এক ছেলে, নাম অরুণ। জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের দুই মেয়ে শান্তি



আর তৃপ্তি। বড় ঘরে বিয়ে হোয়েছে তাদের, ছেলেপুলে নিয়ে  
সংসার করছে। মোটামুটি এই হোল সেন মশায়ের সংসারের চিত্র।

এখন আমাকে বর্ণনা করতে হবে সেন মশায়ের মহাপ্রয়াণ। এই  
মহাপ্রয়াণ থেকেই নাটকের শুরু। সেন মশাই মহাপ্রয়াণ কর্মটি না  
করলে নাটকটি মোটে ঘটতই না, বরুণ সেনকে দাছুর কাছে আসতে  
হোত না, তুলসীকেও জ্ঞানপ্রকাশ অশ্রু পাঠাতেন না। অতএব সেন  
মশায়ের মহাপ্রয়াণ থেকেই আমাকে শুরু করতে হবে।

সেন মশাই মহাপ্রয়াণ করবেন।

দেহত্যাগ প্রাণত্যাগ ধরাধাম ত্যাগ নয় স্বর্গলাভ গঙ্গালাভ  
কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়, ঐ সব ব্যাপারগুলোর চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন  
হচ্ছে মহাপ্রয়াণ। মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন ক্ষণজন্মারা মহাপ্রয়াণ করেন।  
জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশাই সত্যিকারের ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাই তিনি  
ষোড়শোপচারে মহাপ্রয়াণ করবেন। কবে কখন কোন শুভ মুহূর্তে  
মহাপ্রয়াণ করবেন, সমস্ত ঠিক করা আছে। তোড়জোড় শুরু হোল।



সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল। কণ্ডিশন্ সীরিয়াস্—অবস্থা গুরুতর—  
এই সংক্ষিপ্ত সমাচারটি টরেটকার ধাক্কায় ছড়িয়ে পড়ল ছনিয়ার এ  
প্রান্তে ও প্রান্তে। এটুকুই যথেষ্ট, কার অবস্থা গুরুতর, অবস্থা  
গুরুতর বলে কি করতে হবে, এ সমস্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।  
শ্রেফ ঐ গুরুতর সংবাদটি ঐ রকম গুরুতর ভাষায় পাঠানোই সবচেয়ে  
গুরুতর ব্যাপার। অবস্থা প্রেরকের নামটিও গেল ঐ সংবাদের সঙ্গে—  
শচী। শচী ডজন খানেক টেলিগ্রাম করল একই দিনে একই সঙ্গে—  
কণ্ডিশন্ সীরিয়াস্। করে দিয়েই গোপীনাথকে হুকুম করল তৎক্ষণাৎ  
হুঁজন বাড়তি লোক ধরে আনবার জন্তে। রান্না করবে, মানে  
গোপীনাথকে সাহায্য করবে। একা গোপীনাথ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট জন  
মানুষের রান্না সামলাতে পারবে কেন। রান্না নয় শুধু, পরিবেশন  
করা জলখাবার খাওয়ানো হরদম চা দেওয়া, বাজাট আছে। বাসু  
আর শিবু ওরা হুঁজনেও পেরে উঠবে না, ওদেরও বলে দিল শচী যে  
আরও হুঁজন চাকর চাই। ঝি মল্লিকার মা অবস্থা একলাই পারবে,  
তার কারণ একটি কাজের চাপ পড়লেই মল্লিকা এসে মায়ের সঙ্গে  
যোগ দেয়। কাজেই ওদিকে নিশ্চিন্ত।

তারপর শুরু হোয়ে গেল বাড়ির সব ক'খানা ঘর বাড়া মোছা  
পরিষ্কার করা। নিঃশব্দে কাজকর্ম চলতে লাগল, মেন মশায়ের ঘরে  
এতটুকু আওয়াজ পৌঁছল না। বিপুল বিরাট বিশ্বস্তুর পালঙ্কের  
ওপর স্থির হোয়ে শুয়ে রইলেন তিনি, জানতেও পারলেন না যে তাঁর  
মহাপ্রয়াণের জন্তে কী হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে বাড়িতে।

হুলুস্থুল কাণ্ড নয়! ঠিক ঠিকানায় টেলিগ্রামগুলো পৌঁছবার  
সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় লেগে গেল ছনিয়াময়।

ছনিয়ার অপর প্রান্তে বিদেশী দূতাবাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ  
অত্যন্ত জরুরী কর্ম সিকেয় ঝুলিয়ে রেখে সস্ত্রীক হাওয়াই জাহাজে চেপে  
বসলেন। স্বনামধন্য এক ব্যাঙ্কের ভয়ানক রকম কর্তব্যপরায়ণ এজেন্ট  
সাহেব হেড্ অফিসে ট্রান্স টেলিফোন করে দিয়ে বার্থ রিজার্ভ করবার

জন্মে স্টেশনে ছুটলেন। বিলেত ফেরত সার্জন সাহেব অতি দ্রুত অপারেশন অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ঘণ্টায় সত্তর আশী মাইল বেগে মোটর হাঁকিয়ে বাপের কাছে উপস্থিত হোলেন। বিস্তর কাঠ খড় পুড়িয়ে কোনও রকমে বিদেশী মুদ্রার সংস্থান করে নতুন এক প্লান্ট আনিয়ে কারখানা বসাচ্ছিলেন সরকার। এক পাল লোকের চাকরি হবে, প্রচুর বাণিজ্য বাড়বে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মটি সম্পন্ন হোলে এক লাফে দেশ খানিকটা এগিয়ে যাবে, সবই মূলতুর্বা রয়ে গেল। যে এন্জিনিয়ার সাহেব সেই প্লান্ট বসাচ্ছিলেন, ঐ প্লান্ট কি ভাবে বসাতে হবে তা শিখে আসবার জন্মে যাঁকে জার্মান পাঠানো হয়েছিল, তিনি একদম চাকরিতে ইস্তফা দেবার ভয় দেখালেন। হয় ছুটি দাও, নয়ত ইস্তফা দিচ্ছি। সীরিয়াস্ ব্যাপার, গুরুতর অবস্থা। এমনই গুরুতর অবস্থা যে ছনিয়ার কোনও লাভ লোকসান হিসেব করা চলবে না। যেতেই হবে, তন্মুহূর্তে রওয়ানা দিতে হবে, যথাস্থানে পৌঁছন চাই টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে, বেও-জর পৌঁছন চাই। মহাপ্রয়াণ কিনা, মহাপ্রয়াণ ব্যাপারটা যা তা ব্যাপার নয়। এন্জিনিয়ার সাহেবের সাক্ষাৎ স্বপ্তুর মশাই মহাপ্রয়াণ করবেন, চাট্টিখানি কথা!

সবাই এসে পড়ল! জ্ঞানপ্রকাশ সেন মহাশয় মহাপ্রয়াণ করার উদ্যোগ করছেন, সুতরাং তাঁর তিন ছেলে দুই মেয়ে জামাইরা নাতি নাতনী সবাই সমুপস্থিত হোল। বড় বড় হার্ট স্পেশালিষ্ট চেষ্ট স্পেশালিষ্ট ব্রেন্ স্পেশালিষ্ট ঈয়ার নোজ্ থ্রোট্ স্পেশালিষ্ট, যেখানে যত স্পেশালিষ্ট পাওয়া গেল, সবাইকে ডাকা হোল। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ রকম অজ্ঞতা প্রদর্শন করে মোটা দক্ষিণা পকেটে পুরে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাহেন্দ্রক্ষণটি ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল, ছেলেরা মেয়েরা বৌমা ছ'জন সদা সর্বক্ষণ ঘিরে বসে রইল সেন মশাইকে। একটিবার যদি চোখ মেলেন! একটিবার চোখ মেলে যদি ছ'টি কথা বলেন!



বড় নাতি বরণ টেপেরেকর্ডার নিয়ে সদাসর্বক্ষণ তৈরী হয়ে রইল ঠাকুরদার শেষ বাণী ধরে রাখবার আশায়। সবাই গুণতে লাগল মুহূর্ত, মুহূর্ত গুণতে গুণতে ঘণ্টা, ঘণ্টা গুণতে গুণতে দিন, দিন গুণতে গুণতে সপ্তাহ কাবার হোল। টেলিগ্রাম করার পর আট দিন আট রাত এক ভাবে কাটল, স্থির হয়ে শুয়ে রইলেন জ্ঞানপ্রকাশ। ওষুধ-পত্র গ্লুকোজ ইন্জেকশন করে শিরার ভেতর দেওয়া হোতে লাগল। তাতে বুকটা শুধু ধুকধুক করতে লাগল, শ্বাস-প্রশ্বাস সব সময় এক-ভাবে বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

নবম রাত—রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

ঘরে শুধু বড় ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ আর বড় বৌ মণিকুন্তলা। জ্যোতিপ্রকাশ পালঙ্কের পাশে একটা টুলের ওপর বসে আছেন। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বাপের মুখ পানে। চেষ্টা করছেন মিল খুঁজে বার করবার। সবাই বলে এসেছে এতদিন যে বাপ আর ছেলের মুখের আদল নাকি এক রকম। একটা ফোটা আছে অনেকদিন আগে তোলা। জ্ঞানপ্রকাশ তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফোটা তুলিয়েছিলেন। সেই ফোটাখানায় সত্যিই অদ্ভুত মিল দেখা যায়। ছেলের মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি কাটলে আর অল্প একটু গোঁফ নাকের তলায় বসিয়ে দিলে বাপ ছেলেকে চিনে বার করা সত্যিই অসাধ্য। কিন্তু কোথায় সেই মুখ! জ্ঞানপ্রকাশ সেনের মুখ কি ঐ রকম! জ্যোতিপ্রকাশ দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন। শীর্ণ শুকনো লম্বাটে ধরণের মুখ, ছুই গাল ভয়ানক রকম বসে গেছে, কপালটা খুব বেশী ঠেলে বেরিয়েছে, মাথার মাঝখান পর্যন্ত চুল নেই, খোঁচা খোঁচা সাদা গোঁফে দাড়িতে প্রায় সারা মুখটাই গেছে ঢেকে। ঐ জ্ঞানপ্রকাশ সেন!

মনশ্চক্ষু দিয়ে নিজের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলেন জ্যোতিপ্রকাশ। তারপর হিসেব শুরু করলেন। কত বয়েস হোল বাবার! তাঁর নিজের বয়েস হোল তিন্মান, তাঁর চেয়ে ঠিক কুড়ি

বছর বেশী। ঠিক তিয়ান্তর। কুড়িটা বছর পার হোলে তিনিও ঐ রকম হোয়ে যাবেন নাকি।

বিষম রকম শিউরে উঠলেন নিজের কথা ভেবে। মাত্র বিশ বছর, বিশটা বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আচ্ছা—বিশ বছর আগে কেমন অবস্থা ছিল তাঁর। তখন তিনি কোথায় ছিলেন! কি করতেন!

ছিলেন তখন খাজাঞ্চী। তেত্রিশ বছর বয়েসে বার বছর খাজাঞ্চী-গিরি করা হোয়ে গিয়েছিল তাঁর। এক কাঁড়ি টাকা জমা রেখে ঐ খাজাঞ্চীর চাকরি পেয়েছিলেন। নিজের কারবারে না লাগিয়ে ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী করে দিয়েছিলেন কেন বড় ছেলেকে জ্ঞানপ্রকাশ? সঠিক জবাব কেউ দিতে পারবে না। একটা মুখের মত জবাব দিয়ে-ছিলেন নাকি তখন জ্ঞানপ্রকাশ। বলেছিলেন, সোনার বেণের ছেলে হোয়ে জন্মেছে, টাকাকড়ি ঘাঁটুক। টাকাকড়ি না ঘাঁটলে টাকাকড়ির মর্যাদা দিতে শিখবে না!

সেই খাজাঞ্চীগিরি করতে করতে এজেন্ট হোয়েছেন। পরপর পাঁচটা জায়গায় এজেন্ট হোয়ে ব্যাঙ্ক চালালেন। জ্যোতিপ্রকাশ সেন নামটা কত কোটি বার সই করেছেন তার হিসেব নেই। নামটা এখন বহু লোক জানে, পাঁচটা প্রদেশের বহুলোক বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি ব্যাঙ্কের এজেন্ট জ্যোতিপ্রকাশ সেনকে চেনে। বিশ বছর পরে কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারবে না, বাবাকে দেখে যেমন চেনা যাচ্ছে না। বিছানায় যিনি শুয়ে আছেন, উনিই হচ্ছেন সাক্ষাৎ জ্ঞানপ্রকাশ সেন এ কথা এখন কে বিশ্বাস করবে!

তাঁর নিজের ছেলে বরুণের কথা মনে পড়ে গেল, আগাগোড়া মনে পড়ল। বিশ বছর আগে কেমন ছিল বরুণ। উঃ কি ভয়ানক ছরস্তুই না ছিল। আর এখন একজন পাকা ম্যারীন্ এন্জিনিয়ার। আর ঐ মেয়ে মুক্তা, এই বয়েসেই কলেজে চাকরি পেয়েছে, একেবারে মাননীয় অধ্যাপিকা হোয়ে পড়েছে। বিশ বছর আগে ছিল ছ'বছরের মেয়ে!



চৌচাত, শুধু চৌচাত। পান থেকে চুণ খসলে আর রন্ধে নেই। ওর চৌচানির জ্বালায় অস্থির হয়ে এক এক দিন মণিকুন্তলা তাঁকে ফোন করে ডেকে আনতেন বাড়িতে। কি ব্যাপার! না—মেয়ে চৌচাচ্ছে থামাতে পারছি না। সেই মেয়ে এখন অধ্যাপিকা। ঐ তরুণটা তখন জন্মায়নি, বিশ বছর আগে ঐ তরুণ এই ধরাধামে মোটে ছিলই না। বিশ্বাস করবে এখন সে কথা ঐ ছেলে! ইতিমধ্যেই হকি খেলতে খেলতে আধখানা পৃথিবী ঘুরে এসেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড় তরুণ সেনের সামনে কে বলবে এখন—আজ্ঞে সার বিশ বছর পূর্বে আপনি মোটে এই ধরাধামে ছিলেনই না। ছেলে মেয়েরা সব ভয়ানক রকম বিখ্যাত হয়ে পড়েছে, বিশ বছর আগে আর পরে কত তফাত, কত তফাত! ঐ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এখন তাঁকে দস্তুরমত বিচার বিবেচনা করে, সোজা কথায় সমীহ করে কথা বলতে হয়। বিশ বছর আগে কি এটা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন!

কেমন একটা অভিমানের মত, ঠিক অভিমান নয় একটা ব্যথার মত, কোথায় যেন ব্যথাটা টনটন করে উঠল। জ্যোতিপ্রকাশ বাবার মুখপানে তাকিয়ে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কবে তিনি কথা বলেছেন বাবার সঙ্গে। বাবা কি কখনও কথা বলেছেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বা প্রীতির সঙ্গে বা ছাতির সঙ্গে।

একদম নয়, কখনও জ্ঞানপ্রকাশ সেন একটি কথা বলেননি ছেলে-দের সঙ্গে, কখনও না।

তিন ভাই কোনও দিন বাপের সঙ্গে একটি কথা বলতে পারেনি, মানে জীবনে কখনও কথাবার্তা বলার সুযোগই ঘটেনি। বোন ছোটো শান্তি আর তৃপ্তি ওরা হয়তো বলেছে।

জ্ঞানপ্রকাশ সেন—বাবা। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বাবা মানে এমনই এক ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ভীষণ ব্যাপার যে তাঁর সামনে যাওয়াই যায় না। যাবার উপায় নেই। বাড়ির নিচে তলায় বাবার অফিস, ম্যানেজার হেডক্লার্ক কেরাণী দরোয়ান চাপরাসী বেয়ারা, তারপর হোমরাচোমরা

সাহেবরা দালালরা ঠিকাদাররা, এলাহি কাণ্ড। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা লোক গিসগিস করছে। তার ভেতর আছেন বাবা, স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞানপ্রকাশ সেন নিজের ঘরে বসে আছেন, কাজ করছেন। খাস কামরার দরজায় বসে আছে খাস বেয়ারা মহামান্য আবহুল করিম খাঁ। জাঁদরেল পাগড়ি, জবরদস্ত গালপাট্টা, জবরজঙ্গ পোশাক, কোমরে আবার একখানা তলোয়ার ঝুলছে। খাঁ সাহেবকে অতিক্রম করলে বাবার নাগাল পাওয়া যাবে। সে কর্ম ঐ বড় বড় সাহেবরা ঠিকাদাররা দালালরাই পারে, খাঁ সাহেব যাকে তাকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। ব্যস—ঐটুকুই তাঁদের তিন ভায়ের জানা ছিল। তিন ভাই বাবাকে খাঁ সাহেবের চেয়ে সাংঘাতিক জীব বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ খাঁ সাহেব যাঁর হুকুমে ওঠে বসে তিনিই হোলেন বাবা। বাবার চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার ছনিয়ায় আর কি আছে!

বাবা সম্বন্ধে ঐ ছিল তাঁদের ধারণা! জীবনে তাঁরা বাপের সামনে যেতে পাননি, বাবা তাঁদের তিন ভায়ের সঙ্গে জীবনে কখনও কথা বলেননি। লেখাপড়া শিখলেন, চাকরি করলেন। বিয়ে হোল, সংসার হোল। ব্যস ফুরিয়ে গেল। জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের মনে আক্ষেপ নেই। তাঁর তিন ছেলেই জীবনে দাঁড়িয়ে গেছে। ঐ যে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন নিশ্চিন্ত হোয়ে, ইঁ্যা পরম নিশ্চিন্ত হোয়েই শুয়ে আছেন, কোনও আক্ষেপ নেই কিনা মনে, ছেলে তিনটে মানুষ হোয়েছে, মেয়ে ছ'টোর বিয়ে হোয়ে গেছে, ব্যবসা করেছেন খেটেছেন টাকা রোজগার করেছেন। টাকাগুলো ভাগ করে দিয়েছেন হাসপাতালে হাসপাতালে, ফুরিয়ে গেছে। জীবনে যা কিছু করা উচিত, সমস্তই বেশ গুছিয়ে করে ফেলেছেন, পাওনা নেই দেনা নেই, তাই হাহাকারও নেই।

নেই হাহাকার!

জ্যোতিপ্রকাশ ভয়ানক রকম মুষড়ে পড়লেন। সত্যিই হাহাকার নেই বিন্দুমাত্রও ওঁর জীবনে! ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী সবাইকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন বলে মন খারাপ হচ্ছে না ওঁর! কারও মুখমনে পড়ছে না!



পড়বে কেমন করে। কারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখেননি জীবনে, কাউকে কাছে ডাকেননি, কাউকে কখনও ভাল মন্দ একটি কথা বলেন নি। সবাই পর, ছেলেরা পর, মেয়েরা তো আরও পর। রাশি রাশি টাকা দিয়ে বড়মানুষের ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, কতটা সম্প্রদান করার পর জামাইদের মুখও দেখেননি বোধ হয়, জামাইদের হয়তো চিনতেই পারবেন না। নাতি নাতনী সবসুধ কটা আছে ওঁর তাও হয়তো জানেন না। দয়া নেই মায়া নেই স্নেহ মমতা ভালবাসা কিছু নেই, আছে শুধু কর্তব্যবোধ। স্রেফ এক গাদা কর্তব্যের ফাইল ঘাড়ে করে জন্মেছিলেন, ফাইলগুলো ক্লীয়ার হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছেন ছুটিতে, ছুটিতে যাবার সময় মন খারাপ হবে কেন।

তিনি পারবেন! ঐ ভাবে চলে যেতে পারবেন তিনি! ঐ বরণ মুক্তা তরুণ, ঐ শ্রীতি আর দ্যুতির জন্তে তাঁর মনটা হাহাকার করে কাঁদবে না চলে যাবার সময়!

শ্রীতিপ্রকাশের ছেলে অরুণের মুখটা হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভয়ানক অশ্রুমনস্ক হয়ে পড়লেন জ্যোতিপ্রকাশ। তাঁর নিজের ছুই ছেলে এক মেয়ে, ওদের তিন জনের চেয়ে ভায়ের ছেলে অরুণ তাঁর বেশী আপন। শ্রীতিপ্রকাশের স্ত্রী শিখা স্বামীর সঙ্গে বিদেশের দূতাবাসে কাটায়। ছেলে থাকে জেঠামণি জেঠিমণির কাছে, একদম সেই ছোটবেলা থেকে মণিকুন্তলা অরুণকে মানুষ করছেন। অরুণ এক রকম নিজের বাবা মাকে চেনেই না, জেঠামণি জেঠিমণিই তার বাপ মা। ঐ অরুণটাকে ছেড়ে যেতে হবে! ঐ অরুণটা তাঁর বিছানার পাশে বসে কাঁদবে—ঈস্! জ্যোতিপ্রকাশ একেবারে মনমরা হয়ে পড়লেন। নিজের চিন্তাতেই মশগুল, বাপের পানে তাকাবার ফুরসত সেই।

সামান্য একটু ধাক্কা লাগল ডান পাশে, চমকে উঠলেন জ্যোতিপ্রকাশ। ধাক্কাটা দিয়েই মণিকুন্তলা স্বপ্নের মুখের ওপর ঝুঁকে

পড়েছেন। লাফিয়ে উঠে জ্যোতিপ্রকাশও বুঁকে পড়লেন; মনিকুন্তলা ফিসফিস করে বললেন—“কি যেন বলছেন বাবা, কি যেন বললেন—”

জ্যোতিপ্রকাশ দেখতে পেলেন ঠোট নড়ছে, পরমুহূর্তে বুঝতে পারলেন ছই চোখ মেলে আছেন বাবা। আর থাকতে পারলেন না, আকুল হয়ে ডেকে উঠলেন—“বাবা—”

নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাড়িটা জেগে উঠল। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ছুটে এসে জমা হোল দরজার সামনে। প্রীতিপ্রকাশ জ্যোতিপ্রকাশ ছই মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ভিড় হবার ভয়ে আর কেউ ঘরে ঢুকল না। বরুণ চালিয়ে দিল টেপারেকর্ডার, সবই ঠিক করা আছে, একটি কথাও যদি বলেন দাখ্ ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

দম আটকে কান খাড়া করে রয়েছে সকলে, একটি বার একটু গলার আওয়াজ শোনা চাই। আশা মিটল না কারও, একটু পরে ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চৈঁচাতে চৈঁচাতে বেরিয়ে এলেন জ্যোতিপ্রকাশ, শচী কই—শচীকে ডাক—বাবা ডাকছেন শচীকে, শচী—শচী—

ছড়োছড়ি ছুটোছুটি লেগে গেল। কোথায় শচী? শচী গেল কোথায়?

বান্ধু কূটনীতিক প্রীতিপ্রকাশ, সহজে যাঁর মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না, বলে ফেললেন—“কি আশ্চর্য—! শচীর কথা আমাদের কারও মনে পড়েছে এ পর্যন্ত! এখানে এসে শচীকে তো দেখতে পাইনি!”

নিচে জ্যোতিপ্রকাশ চৈঁচাচ্ছেন—“কি মুশকিল কাছাকাছি থাকে না কেন সে—গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ—”

খোঁজা হোল। ওপর নিচে তন্নতন্ন করে খোঁজা হোল। কোথাও পাওয়া গেল না শচীকে। বান্ধু শিবু গোপীনাথ মল্লিকার মা সকলেরই ঘুম ভেঙেছে তখন। ওরাও জানে না শচী কোথায় গেছে। মল্লিকার মা বললে যে রাত এগারটার সময় যখন সে গুতে যায় তখন দেখেছে



শচীকে। ওই গেটের ও পাশে বেলগাছ তলায় অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

“সে সময় তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন?”

“অত রাতে গেটের বাইরে কি করতে গিয়েছিলে তুমি?”

“দরোয়ানদের ডাক, জিজ্ঞাসা কর অত রাতে গেট খোলা ছিল কেন।”

সবাই রুখে উঠল মল্লিকার মায়ের ওপর। মল্লিকার মা সত্যি কথাই বললে। রাতে খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর এঁটো-কাঁটা যা পড়ে থাকে পাতে তাই কুড়িয়ে নিয়ে সে একটিবার তার ঘরে যায়। তার ঘর মানে মেয়ে জামাইয়ের ঘর। ছোটো নাতি-নাতনী আছে, তাদের দিয়ে আসে পাতকুড়ানো এঁটোকাঁটাগুলো। ফেলে দিয়ে কি লাভ হবে আঁস্তাকুড়ে, কুকুর বেড়ালে খাবে। তার চেয়ে মানুষের বাচ্চায় থাক।

দরোয়ানরা এল। তারাও দেখেছে শচীবাবুকে। উনি তো রোজ রাত্রেই বেরিয়ে যান। রাত এগারটার পর বের হন আর সূর্য উদয়ের আগে ফিরে আসেন। এসে পড়বেন একটু পরে, ঠিকই এসে পড়বেন।

বেরিয়ে যায় রোজ রাত্রে! কোথায় যায়? যায় কেন? কত দিন থেকে বেরুচ্ছে? বাবা তা’হলে একলা থাকতেন রাত্রে?

না, একলা জ্ঞানপ্রকাশ থাকতেন না কখনও। আগে মানে যখন তিনি শয্যাশায়ী হননি তখন শচীর সঙ্গে রাত এগারটার পরে বেরিয়ে যেতেন। অশুখ হবার পর শচী একদিনও কোথাও যায়নি। ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজনরা এসে পড়ল, তারাই পাহারা দিতে লাগল দিবারাত্র জ্ঞানপ্রকাশকে। শচীও সেই থেকে রোজ রাতে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আর একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন বড় জামাই নয়নমণি ধর। যদিও আর কোনও প্রশ্ন করা চলে না, স্বরণ কর্তা যখন জড়িয়ে আছেন এই ব্যাপারটার সঙ্গে তখন ও বিষয়ে কিছু জানতে চাওয়াটা যে কত বড়

বেদস্তর কর্ম তা জেনেও তিনি বেয়াদবিটা করে ফেললেন—“কর্তাবাবুও কি প্রত্যেক দিন রাতে শচীর সঙ্গে যেতেন?”

তিনজন দরোয়ানের ভেতর একজন হচ্ছে জমাদার। অর্থাৎ সে সর্দার। সেই সর্দারটি এবার চটে উঠল। চটলেও যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে জবাব দিল—“সে কথা আমরা জানব কেমন করে হুজুর। আমরা হুকুমের নোকর, খোদ মালিক কখন কবে কোথায় যাবেন সেটা তাঁর মর্জি। তাঁর ওপর তো নোকররা নজর রাখতে পারে না।”

চুকে গেল। আবার সকলে ভিড় করে এসে দাঁড়াল জ্ঞানপ্রকাশের দরজায়। বেরিয়ে এলেন জ্যোতিপ্রকাশ ঘর থেকে, এসে ঘোষণা করলেন—“শচীকে চাই, যখনই সে ফিরবে তখনই বাবার সামনে হাজির করতে হবে।”

হুঁশ হয়েছে তা’হলে! শচী যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ হুঁশটুকু থাকবে তো!

রহস্যময় হাসি হেসে জ্যোতিপ্রকাশ বললেন—“এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্তেও উনি বেহুঁশ হননি, এ সংবাদটি শুনে তোমরা কেউ আবার বেহুঁশ হয়ে পোড় না যেন।”

বেহুঁশ হবার ফুরসত কোথায় তখন। একটা রহস্যময় আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। গলায় ঘটি বাঁধা এক পাল ছাগল গরু যেন এগিয়ে আসছে। সাত সকালে এ আবার কোন আপদ!

দরোয়ানরা ভেড়ে গেল। তাদের পিছু পিছু বরণ তরুণ ছুটল। জ্যোতিপ্রকাশ হেঁকে বললেন—“ঘুরিয়ে দাও। অগ্নি পথে ওদের ঘুরিয়ে দাও। এ বাড়ির দিকে যেন না আসে। এখন এতটুকু আওয়াজ সহ্য হবে না বাবার, একটুও গোলমাল হয় না যেন—”

গোলমাল কিছই হচ্ছে না, শুধু টিং টাং শব্দ। একটা ছুঁটো নয়, এক পাল গরু কিংবা ছাগল চলে আসছে সেন বাড়ির দিকে, এক সঙ্গে বিশ পঞ্চাশটা ঘটি বাজছে। একেবারে গেটের ভেতর এসে গেল। যে! রুখছে না কেন ওদের! তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন!



• ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে এ ওর মুখ পানে তাকাতে লাগলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখবেন সে সামর্থ্যও নেই যেন কারও। সময়টা সাংঘাতিক, দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণ উষালগ্ন। ফেকাশে হোয়ে উঠেছে চারিদিক, ঘরের মধ্যে একজন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত হোয়েছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু সেই রহস্যময় ঘন্টির আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। নিচের দালানে ঢুকে পড়ল নাকি! ছাগল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসবে নাকি!

ছ'টি কাণ্ড ঘটে গেল একসঙ্গে। হঠাৎ এক বিচিত্র গন্ধ নাকে গেল সকলের, সেই সঙ্গে একটা কিস্তুতকিমাকার সুর কানে গেল। সুর নয় ঠিক, গোঁ গোঁ আওয়াজ। চাপা গলায় কয়েক জন অবোধ ভাষায় কি যেন আওড়াচ্ছে। ঘন্টির আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেছে সেই গোঁ গোঁ আওয়াজ, দস্তুরমত রহস্যময় ব্যাপার। সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, রহস্যময় আওয়াজটা সিঁড়ির ভেতর গুম্‌গুম্‌ করছে যেন। দম আটকে সবাই তাকিয়ে রইলেন সিঁড়ির দরজার দিকে, বিচিত্র গন্ধটার দরুণ সকলের মাথার ভেতর বিম্বিম্ব করতে লাগল।

কি বেরুবে সিঁড়ির দরজা দিয়ে! কারা আসছে!

অবশেষে দেখা গেল। একে একে দরজা পেরোতে লাগল, গলা থেকে পা পর্যন্ত কমলা রঙের আলখাল্লায় ঢাকা নেড়া মাথা সাতটি প্রাণী একে একে দরজা পেরোল। প্রত্যেকের বাঁ হাতে একটা জলন্ত ধূপকাঠি, ডান হাতে একটা চক্রের মত জিনিষ। সেটা ঘুরছে, তার চার পাশে ঝোলানো ছোট ছোট ঘন্টিগুলো টুং টাং শব্দ করছে। সাতটি প্রাণী সোজা সারবন্দী হোয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। নতদৃষ্টি তাদের, হয়তো চোখ বুঁজে আছে। এক সুরে এক ভাবে আওড়াচ্ছে তারা অদ্ভুত এক মন্ত্র, একই মন্ত্র বার বার আওড়াচ্ছে। এগিয়ে আসতে লাগল জ্ঞানপ্রকাশের ঘরের সামনে, সেখানে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন সবাই। তাকিয়ে আছেন শুধু, এতটুকু নড়বারও শক্তি নেই।

ওরা এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের মত একপাশে সরে

গেলেন এঁরা। ওরা সবাই ঘরের ভেতর ঢুকল। ঘরের ভেতর থেকে সেই গোঁ গোঁ শব্দটা ঘন্টির শব্দের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসতে লাগল।

তখন নজর পড়ল সকলের। দেখলেন, বরুণ আর তরুণ কাকে যেন বয়ে নিয়ে আসছে। যাকে নিয়ে আসছে তার অবস্থা শোচনীয়। ঘাড় ভেঙে গেছে যেন, মুখটা বুকের ওপর ঠেকে আছে।

দরজার সামনে এনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল ওরা। ছেড়ে দিল না, ছুঁপাশ থেকে ধরে রইল। তখন তাকে চিনতে পারলে সবাই। কে যেন বলে উঠলেন “শচী!”

শচী মুখ তুলল প্রাণপণ চেষ্টায়, চোখ মেলে তাকাল সকলের মুখ পানে। তারপর তিনবার উচ্চারণ করল—“ওঁ মণিপদে হুঁ, ওঁ মণিপদে হুঁ, ওঁ মণিপদে হুঁ।”

মহাপ্রয়াণ কর্মটি সগৌরবে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করলেন জ্ঞানপ্রকাশ। ধূপের গন্ধ মন্ত্রধ্বনি ঘন্টীর টিং টাং সমস্ত মিলেমিশে একটা অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করল। তার মধ্যে ঠিক কখন যে বুকের ধুকধুকটুকু থেমে গেল, কেউ বুঝতে পারলেন না। তিন ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ প্রীতিপ্রকাশ ত্র্যুতিপ্রকাশ বাপের বিছানা ছুঁয়েই দাঁড়িয়েছিলেন, দুই বৌ দুই মেয়ে ঘরের মধ্যেই ছিলেন, লামারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে এক ভাবে মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন আর চক্র ঘোরাচ্ছিলেন। এঁরা সবাই কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাকিয়ে ছিলেন শুধু সেই লামাদের পানে। জ্ঞানপ্রকাশের দিকে নজর ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ, তা অন্ততঃ দশ পনেরো মিনিট তো হবেই, ওঁরা ছিলেন ঘরের মধ্যে, সমানে মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন, মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। দরজার সামনে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরাও সবাই গাছ পাথরের মত স্থির হয়ে ছিলেন। ওঁরা নেমে গেলেন নিচে, বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে, গেট পেরিয়ে গেলেন, ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।



টং টাং আওয়াজ। তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল। তখন হঠাৎ শোনা গেল ডাক। ঘরের ভেতর দ্যুতিপ্রকাশ চিৎকার করে উঠলেন—“বাবা-বাবা—”। সেই চিৎকার শুনে বাইরে যারা ছিলেন তারা ছড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। তখন আর কিছু বলবারও নেই। দুই মেয়ে বাপের পায়ের ওপর মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ চাপবার চেষ্টা করছেন। বিভ্রান্ত জ্যোতিপ্রকাশ বাবার বুকের ওপর ডান কান চেপে ছেলেমানুষের মত কি যেন শোনবার আশা করছেন। স্তব্ধ হোয়ে আছেন শ্রীতিপ্রকাশ, বাপের একখানি হাত তাঁর দু’হাতের মধো ধরা। দ্যুতিপ্রকাশ শুধু ধড়ফড় করছেন, কি একটা ওষুধ বাপের ঠোঁটের ফাঁকে ঢালবার চেষ্টা করছেন তখনও।

শেষ।

কেমন যেন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন জ্ঞানপ্রকাশ সেন। বাবার সময়ও ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী কারও সঙ্গে একটি কথা বললেন না। ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্যে আগে থাকতে পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ঠিক সময় শচী ওই লামাদের ডেকে এনেছিল। শচী সব জানত, কখন দেহত্যাগ করবেন জ্ঞানপ্রকাশ তা জানত শচী। একমাত্র শচীকেই বিশ্বাস করতেন উনি, শচীই একমাত্র আপন-জন। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী বৌয়েরা জামাইরা কেউ কিছুই নয়।

চাপা অভিমান গুমরে উঠতে লাগল সকলের বুকের মধ্যে, মুখ ফুটে কেউ কিছুই বললে না। বলবার আর আছে কি! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, যে ভাবে যে কর্মটি সম্পন্ন করবেন বলে মনস্থ করতেন জ্ঞানপ্রকাশ আজীবন সেই কর্মটি সেই ভাবে সম্পন্ন করেছেন। এক চুল এধার ওধার হবার জো নেই।

তাই হোল, সর্বশেষ কর্মটিও সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হোয়ে গেল।

তারপরের কাজগুলো অবশ্য ছেলেরা জামাইরা নাতিরা নিজেদের

মজি মাফিক করে ফেললে। বিরাট ধুমধাম করে জ্ঞানপ্রকাশের দেহ  
বয়ে নেওয়া হোল শ্মশানে, প্রচুর ঘি এবং চন্দন কাঠ দিয়ে পোড়ানো  
হোল। দূর সহর থেকে কয়েকজন নাতুগণ্য ভদ্রলোক এবং ছ’  
চারটি হোমরাচোমড়া সরকারী কর্মচারী উপস্থিত হোলেন। হোতেই  
হবে, নামজাদা কুটনীতিবিদ প্রীতিপ্রকাশের বাবা যে জ্ঞানপ্রকাশ  
সেন। স্মৃতরাং শ্মশানে যারা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নাম হয়তো  
প্রীতিপ্রকাশের স্মরণ থাকবে। সংবাদপত্রেও উঠতে পারে।

সর্বকর্ম সুসম্পন্ন করে প্রায় সন্ধ্যার সময় সেন বাড়িতে ফিরে  
এলেন সকলে। তখন ছুটি, সে রাত্রের মত বিশ্রাম। রাত পোহালে  
অন্য সব কর্তব্যের ভাবনা ভাবা যাবে। সেদিন তখন আর কোনো  
কিছু আলোচনা করার মত শক্তি বা প্রবৃত্তি নেই কারও। যে যার  
ঘরে গিয়ে কঞ্চল পেতে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত বাড়ি নিবুম হোয়ে গেল।

একটিমাত্র জীব কিন্তু জেগে রইল। গভীর রাতে টেপেরেকর্ডার  
চালাল সে। ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ, এতটুকু শব্দ বাইরে যাবে  
না। শব্দটা এত কমিয়ে দিল যে একমাত্র সে ছাড়া আর যেন কেউ  
শুনতে না পায়। ঘুরতে লাগল টেপ, একটা থেকে খুলে আর  
একটায় জড়াতে লাগল। কান পেতে রইল বরুণ সেন, পঁচিশ বছর  
বয়সের পাক্সা ম্যারীন্ এন্জিনিয়ার। প্রচুর টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনেছে,  
এ দেশে ও জাতের যন্ত্র মিলবেই না। যন্ত্রটার কায়দা এমন যে একটা  
টেপ শেষ হোলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চালু হোয়ে যায়। যন্ত্রটা কি  
বেইমানী করবে!

না—ঐ তো ছোট কাকার গলা—শচী কই শচী কই—বলে  
চৈঁচাচ্ছেন। ঐ তো মেজকাকা বললেন, শচীকে মোটে দেখতে পান  
নি। তারপর! তারপর! ঐ দরজার বাইরে দরোয়ানদের সঙ্গে  
কথাবার্তা হচ্ছে। আচ্ছা বেশ, তারপর।

ক্রমে সেই ঘণ্টাধ্বনি একটু একটু করে স্পষ্ট হোল। বুঝতে  
পারল বরুণ যে ওরা ঘরের ভেতর এসে গেল। তারপর চলতে লাগল  
একঘেয়ে সেই মন্ত্র আওড়ানো।



কিন্তু ও কি।

ওটা কি হোল।

বন্ধ করলে যন্ত্র বরুণ, আবার একটু আগে থেকে চালান। আবার  
শোনা গেল, হাঁ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

কে বললে ও কথা! দাছ! দাছ বললে! কি বললে যেন!

আর একবার থামিয়ে আগে থেকে চালিয়ে দিল। এবার আর  
ফসকাল না। স্পষ্ট ধরা পড়ল। নাতির যন্ত্রটাকে ফাঁকি দিয়ে  
পালাতে পারেননি জ্ঞানপ্রকাশ সেন, নাতি বরুণের হাতে ধরা  
পড়েছেন।

যা বলেছেন দাছ তা' পর পর কয়েকবার শুনে নিল বরুণ।  
সামান্য একটি কথা বলেছেন, বলেছেন কিন্তু ছ'বার। অদ্ভুত কথা—  
লুতাতন্ত। এই একটি কথাই ছ'বার উচ্চারণ করেছেন “লুতাতন্ত—  
লুতাতন্ত।”

মাস দেড়েক পরে সমাপ্ত হোল যজ্ঞ। সেই দেড় মাস ঠায় জেগে রইল পাহাড়ী জায়গাটা। বিচিত্র ধরণের অসংখ্য মোটর গাড়িতে চেপে বিস্তর বিশিষ্ট মানুষ সপরিবারে উপস্থিত হোলেন। অদ্ভুত আকৃতির বিস্তর কুকুরও এল মালিকের সঙ্গে। ঘোড়া এল বন্দুক এল। বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো তাঁবু খাটানো হোল। তাঁবুতে তাঁবুতে নাচ গান জলসা চলতে লাগল। বনের পাখী মেরে আর যত্র-তত্র রান্না করে খেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তির নির্মল আনন্দ উপভোগ করলেন। ভয়ানক রকম কাজের মানুষ কিনা সবাই, সহজে কর্মস্থল ত্যাগ করে বাইরে বেরবার ফুরসত পান না। জ্ঞানপ্রকাশ সেন মহাপ্রয়াণ করে মস্ত একটা সুযোগ দিয়ে গেলেন। হাঁ, রুচি ছিল মিষ্টার সেনের, এ কথা মানতেই হবে। আজীবন পরিশ্রম করে অত বড় বড় ব্যবসা চালিয়ে শেষে যখন অবসর গ্রহণ করলেন, তখন একদম সহর ত্যাগ করে এসে পাহাড়ের কোলে নির্জনতায় আশ্রয় নিলেন। এরই নাম হচ্ছে বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থের উপযুক্ত স্থানটিও বটে। কে জানত, হিমালয়ের পায়ের কাছে এমন একটি স্থান আছে! হাঁ, একথা মানতেই হবে যে মিষ্টার সেনের রুচি ছিল ভয়ানক উঁচুদরের।

মিষ্টার সেনের ছেলেদের মেয়েদের মায় জামাইদের রুচিও তারিফ করার মত। চেনা জানা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন কাউকে নেমস্তম্ভ করতে বাকী রাখলেন না। এলেনও সবাই, সপরিবারে এলেন। তাঁবু বন্দুক কুকুর ঘোড়া নিয়ে এলেন। এসে পস্তাতে হোল



কাউকে, সকলের জন্মে সব রকমের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন এঁরা। সুতরাং সবাই চুটিয়ে ক্ষুতি করে গেলেন। সেই বিপুল সমারোহ মাস দেড়েক পরে চুকে গেল। আলো নিভল পাহাড়ে জঙ্গলে, আকাশ বাতাস জুড়াল। আবার সেই আগের মত ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল চতুর্দিক, পাখীর ডাক শোনা যেতে লাগল। এঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার বাড়িখানার একটা বিলি ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়। তারপর কর্তারাও যে যার কর্মস্থলে চলে যাবেন।

সেন মশায়ের মেয়ে জামাইরা চলে গেছেন। আছেন শুধু তিন ছেলে দুই বোঁ আর চার নাতি-নাতনী। ওঁরাও যাবেন। যাবার আগে বাড়িখানা দেখাশুনা করার ভার কার ওপর দিয়ে যাবেন, তাই নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছেন। তিনজন দরোয়ান দু'জন চাকর গোপীনাথ আর মল্লিকার মা ওদের ব্যবস্থাই বা কি করা যাবে! শুধু শুধু অতগুলো মানুষকে রাখা হবে না, ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর রয়েছে শচী। এখনও প্রায় বেছাঁশ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। ওরই বা কি হবে!

ওধারে ছুটি ফুরিয়ে আসছে সকলের। সর্বাগ্রে রওয়ানা হোতে হবে প্রীতিপ্রকাশকে, তাঁকে যেতে হবে ছনিয়ার অপর প্রান্তে। রাষ্ট্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর দামী কর্ম করেন প্রীতিপ্রকাশ, এমন কর্ম করেন যে জীটিকে সঙ্গে রাখতেই হবে। ওঁর পক্ষে আরও বেশী দিন ছুটি ভোগ করা সম্ভব নয়।

বড় ভাই জ্যোতিপ্রকাশের অবস্থা তেমন তাড়া নেই। ব্যাঙ্ক ওঁকে আরও কিছুদিন ছুটি মঞ্জুর করবে যদি উনি চান! তবে উনি ছুটি চাইবেন না। কেমন যেন ভয়ানক রকম অশ্রমশ্রম হোয়ে পড়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ বাবা মারা যাওয়ার পরে। হঠাৎ অসম্ভব রকম গম্ভীর হোয়ে পড়েছেন। দস্তরমত বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে হঠাৎ ওঁকে! উনিও চলে যেতে চান। কাজে যোগ দিয়ে হয়তো খানিকটা ভুলে থাকবেন সব, তাই উনি চলে যাবেন।

ছাতিপ্রকাশও যাবেন। কিন্তু শচীকে ফেলে রেখে যেতে পারছেন না। শচী ওঁর চিকিৎসায় রয়েছে যে। তাই ভাবছেন ছাতিপ্রকাশ যে শচীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে হাসপাতালে কাজ করেন সেখানে বিশেষ রকম ব্যবস্থা করে শচীকে রাখবেন। যত দিন না শচী সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে ততদিন—

“কি হয়েছে ওর?” জিজ্ঞাসা করলেন মেজদা প্রীতিপ্রকাশ।

ছাতিপ্রকাশ বললেন—“সঠিক বলা মুশকিল। এমনিতে কোনও রোগ নেই লো ব্লাডপ্রেসার ছাড়া। মনে ভয়ানক রকম শক্ লাগলে অনেক সময়—”

বড়দা জ্যোতিপ্রকাশ বললেন—“লাগবেই তো, লাগবেই তো। বাবা শচীকে আমাদের চেয়ে বেশী আপন জন বলে মনে করতেন। সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন শচীকে, শচীই শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে ছিল।”

ম্যারীন্ এন্জিনীয়ার বরুণ সেন সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী কাটল—“শচী-বাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জানেন দাছুর জীবনের মিষ্ট্রি।”

বরুণের ছোটকাকা ছাতিপ্রকাশ ভেঙে উঠলেন—“মিষ্ট্রি না হাতি। তোর মত বাবা জাহাজে চড়ে সারা ছুনিয়ায় ঘুরে বেড়ান নি, বাবার জীবনে কোনও মিষ্ট্রি ফিষ্ট্রি নেই। যত রাজ্যের মিষ্ট্রি জুটেছে বাবার নাতি বরুণ সেনের জীবনে। মিষ্ট্রিই তোর মাথা খেয়েছে। বারণ করেছিলাম তখন, ঐ জাহাজী অফিসার হোয়ে কাজ নেই।”

ভাইপোটি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত জবাব দিল—“আমিও বারণ করেছিলাম, একশ’ বার বলেছিলাম তখন, ছোটকা ঐ সার্জন ফার্জন হোতে যেও না। মানুষ চিরতে চিরতে একদম খিঁচড়ে যাবে। মানুষের সব রহস্য জেনে ফেলবার পর বেঁচে থেকে সুখ কোথায়।”

অধ্যাপিকা মুক্তা সেন খুড়ো ভাইপোকে থামালেন—“তোমাদের ছ’জনের জন্তে কোনও সময় কাজের কথা হবে না দেখছি। মুখোমুখি



হোলেই লাগবে কচকচি। আজকের মত তা'হলে এখানেই শেষ হোল।”

বলে অধ্যাপিকা উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের মত জরুরী আলোচনা বন্ধ হোল।

ছুতোনাতা কিছু একটা পেলেই হোল, আলোচনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানে ঐ শচী, শ্রীল শ্রীযুক্ত শচীনন্দন সামন্ত, ঐ শচী পর্যন্ত পৌঁছেই আলোচনা বন্ধ করতে হচ্ছে। ওঁরা তিন ভাই শচী সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না। কি সিদ্ধান্ত করবেন! ছাতি-প্রকাশ ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন, ও মাথা নাড়ল। যাবে না, শুধু ঐকুই জানালে। যাবে না তো করবে কি, তা বললে না।

জ্যোতিপ্রকাশ বললেন—“খুবই ভাল কথা, শচী থাকুক বাড়িতে, চল সবাই ওর ওপরই এই বাড়ির ভার দিয়ে। দরোয়ানরা থাকুক মল্লিকার মা তো রইলই। বাসু আর শিবুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাঙ্কে চাকরি করে দোব ওদের। শচী যখন রইল তখন আর আমাদের বাড়ির ভাবনা ভাবতে হবে না।”

চমৎকার প্রস্তাবটি করা হোল শচীর কাছে। শচী মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বাড়ির ভার সে নেবে না। তা'হলে!

ছাতিপ্রকাশ তাকালেন মেজদা'র পানে, মেজদা' তাকালেন বড়দা'র পানে, বড়দা' মুখ লুয়িয়ে রইলেন। তা'হলে কি করা উচিত কেউ ভেবেই পেলেন না। যাই করা হোক, 'বাড়ি থেকে চলে যাও'—এই ভয়ঙ্কর কথাটা তো আর শচীকে বলা চলে না। তিন ভাই স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে বাবা তাকিয়ে আছেন তাদের পানে, ছেলেরা কি করে দেখছেন। দেহত্যাগ করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ সেন এটা যতবড় সত্য, ঠিক ততখানি সত্য হোল বিদেহ জ্ঞানপ্রকাশ সদাসর্বক্ষণ ছেলেদের পানে তাকিয়ে আছেন। সেই চাউনি ছেলেরা সদাসর্বক্ষণ স্পষ্ট টের পাচ্ছে।

শচী যতক্ষণ না নিজে থেকে কিছু করছে বা বলছে ততক্ষণ ওঁরা নিরুপায়। শচী সম্বন্ধে ওরা তিন ভাই প্রাণ গেলেও কোনও মতামত প্রকাশ করবেন না, যেমন কস্মিনকালে পিতা জ্ঞানপ্রকাশ সম্বন্ধে করেন নি। তাই বাড়ির একটা বিলি ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে আলোচনা তোড়জোড় করে শুরু হচ্ছে রোজই, যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানেই থেমে থাকছে। ছুতোনাতা একটা কিছু পেলেই হলো, তাড়াছড়ো করে তিন ভাই তিন দিকে সরে যাচ্ছেন। রওয়ানা হওয়ার দিন কিন্তু এগিয়ে আসছে, আর বেশী অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। কারণ বড় মেজ ছোট তিন ভায়েরই ছুটি ফুরিয়ে এল। মুক্তার কলেজ কামাই হচ্ছে, তরুণ আর অরুণেরও তাই। একমাত্র বরুণ সেন নির্বিকার চিন্তে রয়েছে। কে জানে কত দিনের ছুটি ওর, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছে কিনা তাই বা কে বলবে। কতদিনের ছুটি পেয়েছে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়—“যতদিন খুশি ডাঙ্গায় বসে থাকতে পারি। আমি হচ্ছি নাবিক, জলচর জীব। আমাদের আইনই আলাদা।”

অবশেষে ঐ বরুণই বাবা কাকাদের রেহাই দিলে। বলল—“যাও না তোমরা চাকরি বাকরি করতে। স্থলচর জীবেরা এ ভাবে খামকা বসে আছে দেখলে মাথা গরম হয়। যাও সবাই, চটপট রওয়ানা হওগে। আমার ওপর ভার দিয়ে যাও। তোমরা যখন সামলাতে পার না, আমাদের ডাক পড়ে। অতএব অত্ন হইতে এখানে সামুদ্রিক আইন চালু হচ্ছে, এখন তোমরা সরে পড়।”

তাই হোল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওঁরা রওয়ানা হোলেন। বরুণ রইল, থাকুক যতদিন খুশি, যখন যাবে কিছু একটা ব্যবস্থা করেই যাবে।

বাড়ি নিঝুম, অত বড় বাড়িতে মাত্র দুটি প্রাণী বাস করছে। নিচের তলায় দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরখানায় শুয়ে আছে শচী আর ওপরের মাঝের ঘরে রয়েছে বরুণ। অন্ত সব ঘরে তালা পড়েছে।



রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের সামনের দালানটা যেখানে খাওয়া দাওয়া হয়, ঐ ছ'খানা ঘর আর দালান নিয়ে ছোট্ট একটু বাড়ি বড় বাড়ির পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা তফাতে। সেখানে গোপীনাথ, আর মল্লিকার মা কাজকর্ম করছে। বাস্তু শিবু চলে গেছে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে। দরওয়ানদের মধ্যে একজন ছুটি নিয়ে মুলুক চলা গিয়া। যে ছ' জন আছে তারা থাকে গেটে, বাড়ির দিকে বড় একটা কেউ আসে না। তাই সব নিঝুম। অতবড় বাড়ি-খানায় মাত্র ছ'টি প্রাণী চুপচাপ বাস করছে। ওরা কেউ কারও শাস্তির ব্যাঘাত করে না।

সকালে একবার বিকালে একবার ছ'বার বরুণ ওপর থেকে নিচে নামে, নেমে শচীর ঘরে যায়। সামান্য একটি ছুটি কথা হয়! কথা। অবশ্যই বরুণই বলে যা বলবার, শচী শুধু মাথা নাড়ায়, মাথা নাড়ানো ছাড়া মুখ ফুটে একটি কথাও বলে না।

“কেমন আছ আজ শচীকা?”

শচী মাথা নাড়াল। এমন ভাবে নাড়াল যা থেকে ভাল মন্দ দুই-ই ধারণা করা যায়।

“ছ' একবার একটু ঘুরে এলেও পার। বাগানেই একটু ঘুরলে। ঘর থেকে একেবারে বের হও না।”

পুনরায় শচীর সেই মাথা দোলানো, মাথা দোলানো দেখে যা খুশি ধারণা করে নাও।

“ছোটকা যে ওষুধটা দিয়ে গেছে সেটা ঠিক খাচ্ছ তো?”

আবার সেই নীরব জবাব, ঐ মাথা দোলানো থেকে মাথামুণ্ড কিছুই আন্দাজ করার উপায় নেই। অগত্যা থামতে হয় বরুণকে, একঘেয়ে প্রশ্ন কে কতক্ষণ করতে পারে যদি একটা প্রশ্নেরও জবাব না পাওয়া যায়। লোকটার বাকরোধ হয়নি তো!

তা' হয়নি। দিব্যি কথা বলতে পারে শচী, তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ আছে। সেই টেপারেকর্ডার, লম্বা তার লাগিয়ে সেই যন্ত্রটার কানকে

নিচের ঘরে নামিয়ে রেখেছে বরুণ। রাতে যন্ত্রটাকে চালু করে দেয়। দিনের বেলা কারও সঙ্গে একটিও কথা বলে না শচী, রাতে বলে। খুবই কম বলে, কিন্তু বলে ছ' একটি কথা নিজের সঙ্গে। যা বলে সমস্ত ধরা পড়ছে বরুণের যন্ত্রে। যদিও সে সব কথার কোন অর্থ হয় না, কিন্তু কথা যে বলতে পারে তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ রয়েছে। অতএব বাকরোধ হয়নি।

তা'হলে হয়েছেটা কি !

বরুণ ভাবে, ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠে যায়। ওপরে বসেও ঐ এক কথা ভাবতে থাকে, কি হয়েছে শচীর ! যতক্ষণ না ও সুস্থ হচ্ছে ততক্ষণ যে কিছুই জানা যাবে না। বহু কিছু জানতে হবে যে। দাছ এই নির্জন জায়গায় কি করতেন, রাত্রে কোথায় যেতেন 'শচীকে' সঙ্গে নিয়ে, সেই সাতজন নেড়ামাথা লামা সন্ন্যাসী সেদিন ভোরে কোথা থেকে এল, কোথায়ই বা চলে গেল, সবই জানা যাবে শচীর কাছ থেকে। জানা যাবে যদি ও মুখ খুলে বলে, মুখ না খুললে জোরজবরদস্তি কিছুতেই করা যাবে না।

বাবা এবং কাকারা বারবার সাবধান করে গেছেন—খবরদার যেন কোনও অশুবিধে না হয়।

না, অশুবিধে বরুণ হোতে দিচ্ছে না। কড়া নজর রেখেছে গোপীনাথ আর মল্লিকার মায়ের ওপর, খাওয়া দাওয়া সেবা যন্ত্রের এতটুকু ত্রুটি যেন না হয় শচীকাকার। সাবধান, খুব সাবধান।

খুবই সাবধানে দিন কাটছে। দিনের সঙ্গে রাতও কাটছে। তবে রাতগুলো ঘুমিয়ে কাটছে না। বরুণ সেন রাতের পর রাত জেগে আছে। টেপেরেকর্ডার চালাচ্ছে, কখন কি বলে শচীনন্দন ধরতে হবে। তা' ছাড়া আরও একটা কাজ করছে। মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে তেতলার ছাতে, নিঃশব্দে ঘুরছে ছাতের ওপর। ঘুরছে আর কোমর সমান উঁচু পাঁচিলের ধারে গিয়ে অনেকটা ঝুঁকে বাড়িটার চারধারে নজর দিচ্ছে। অন্ধকারে ওর দৃষ্টি চলে। রাতে অন্ধকার সমুদ্রের



বুকে অনেক দূর পর্যন্ত ওকে নজর রাখতে হয়। তাই করছে, একবার পূবে তারপর দক্ষিণে তারপর পশ্চিমে তারপর উত্তরে, চারিদিকের পাঁচিলের ধারে গিয়ে বুঁকছে। বাড়ির ধারে কাছে কেউ যদি আসে, নিশ্চয়ই ধরা পড়বে ওর নজরে। পাকা নাবিক বরুণ সেনের নজরকে ঠকানো সহজ নয়।

কিন্তু আসবে কে! আসবেই বা কেন!

কেউ যে আসবে এটা ওর ধারণা হোল কেমন করে?

কেন ধারণা হোল তা' বুঝিয়ে বলা শক্ত। ধারণাটি কিন্তু হয়েছে, শচীর ওপর নজর রাখতে রাখতে ঐ একটি মাত্র ধারণাই জন্মেছে বরুণ সেনের মগজে যে কেউ আসবে বা কিছু ঘটবে। সেই আশাতেই শচী অমন ভাবে মুখ টিপে ধৈর্য ধরে রয়েছে।

এবং ঐ একটি মাত্র কারণেই শচীনন্দন বাড়ি ছেড়ে কোথাও গেল না।

বরুণ সেনের টেপারেকর্ডার তাই বলে। নিশীথ রাত্রে একলা জেগে থাকে শচী, তখন মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে দু'একটি কথা বলে ফেলে। সেই কথাগুলোর কোনও অর্থ হয় না, আবার খুব সহজ অর্থও করা যায়।

টেপারেকর্ডার চালিয়ে দিল, বহুবার শোনা কথাগুলো আর একবার মন দিয়ে শুনতে লাগল।

“আর কত দিন! উঃ আর কত দিন!”

“আর পারি না, এ ভাবে বেঁচে থাকতে আর যে পারছি না আমি।”

“জীবন ভোর ঠকেছি, এবারও ঠকব নাকি!”

ওই জাতের সব টুকরো টুকরো কথা। কথাগুলো যেন বুক নিঙ্রে বেরিয়েছে। ঐ সব কথা থেকে কি ধারণা করা সম্ভব!

বরুণ সেন পাহারা দিচ্ছে। দিনে রাতে সমানে পাহারা দিচ্ছে। কেউ আসবে বা কিছু ঘটবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মুশকিল হচ্ছে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। স্বর্গীয়

জ্ঞানপ্রকাশ সেন মহাশয়ের নাতি বরুণ সেন ঝি চাকর দরোয়ানদের কাছে যা-তা প্রশ্ন করতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ শচীনন্দন সম্পর্কে। শচী সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ার অর্থই হোল স্বর্গীয় কর্তার ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করা। তার সোজা অর্থ দাঁড়াবে, জ্ঞানপ্রকাশের জীবন-রহস্য নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে জ্ঞানপ্রকাশের সাক্ষাৎ নাতিটি। এই সুসমাচার জ্ঞানপ্রকাশের তিন পুত্রের কাছে পৌঁছলে কি আর রক্ষে আছে!

তাই বরুণ সেন সদাসম্মত হয়ে রয়েছে। কেউ যেন বুঝতে না পারে তার উদ্দেশ্যটি।

ইতিমধ্যে সেই পাহাড়ী পল্লীটির চতুর্দিকে বছবার ঘোরা শেষ হয়েছে। জানবার বোঝবার দেখবার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সবসুদ্ধ বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গৃহস্থের বাস, সবাই চাষ আবাদ করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই রঙ রূপ আচার ব্যবহার এক রকম। এক দল নিজেদের সাঁওতাল বলে আর এক দল বলে বাগদী। সাঁওতালরা সাঁওতালী ভাষা বলে না, বাগদীরাও বাঙলা বোঝে না। বিচিত্র সুরে বিচিত্র টানে যে ভাষায় আলাপ পরিচয় করে তা হোল দেহাতী হিন্দী। চট্টগ্রাম জেলার পল্লীর মানুষরা বাঙলা ভাষাই বলে, কিন্তু সে ভাষা বোঝা অণু জেলার বাঙালীর পক্ষে যেমন শক্ত, তেমনি ওদের হিন্দী বোঝাও সহজ নয়। কান পেতে মন দিয়ে শুনলে কিন্তু সবই বোঝা যায়। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বরুণ সেনের, সকলেই তাকে পছন্দ করে। পছন্দ করবে না কেন, অত বড়লোকের নাতি কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই। দিব্যি রয়েছে, বন্দুক ঘাড়ে করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কিন্তু পশু পক্ষীর ওপর হামলা করে না। ঐ একটি কারণ যে জগ্গে ওর মত বয়েসের জোয়ানরা ওর বন্ধু হয়েছে।

বুধনু হোল সাঁওতালদের মাতব্বর, বুধনুর ছেলে নাথনু একদিন জিজ্ঞাসা করল—“বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াও, শিকার কর না তো?”

“শিকার কই? কি শিকার করব?” পালটা প্রশ্ন করল বরুণ।



“কেন পাখী। তোমাদের বাড়িতে যে সব সাহেবরা এল তারা সবাই পাখী মারলে।”

“পাখী মারতে যাব কেন? পাহাড়ে জঙ্গলে কত জাতের পাখী ডাকাডাকি করছে, ওরাই হোল এখানকার শোভা। ওদের মারতে যাব কেন? ওরা আমার কোন ক্ষতিটা করছে?”

“তা’হলে কি শিকার করতে চাও তুমি?”

“বাঘ ভাল্লুক বা বুনো গুয়ার, কিন্তু ও সব এ পর্যন্ত দেখতেই পেলাম না।”

“বাঘ নেই এ তলাটে, ভাল্লুক আছে। ভাল্লুক যেখানে থাকে সেখানে বাঘ থাকে না। মহুয়া ফল পাকলে ভাল্লুক নামে। তোমার ঐ বন্দুক দিয়ে ভাল্লুক মারা যায়?”

বরুণ তখন তার দোনলাটির শক্তি কতখানি তা বুঝিয়ে বলল নাথনুকে। ঐ বন্দুকে হাতীও মারা পড়বে তবে ঠিক জায়গায় টিপ করা চাই। টিপই হোল আসল কথা, যেখানে সেখানে গুলি লাগলে কোন জানোয়ারই মরবে না।

সাঁওতালের ছেলে নাথনু তীর ধনুক নিয়ে শিকার করে, টিপের মূল্য বোঝে। কতখানি টিপ আছে ছোকরা সাহেবটির হাতে, খুবই ইচ্ছে হোল জানবার। কিন্তু ও জাতের কিছু জিজ্ঞাসা করাটা বোকামি করা হবে। তাই অণু কথা পাড়ল।

“তা’হলে চল না একদিন পাহাড়ে গুয়ার মারতে। আমরাও কয়েকজন তোমার সঙ্গে যাব। গুয়ার মারতে গিয়ে অনেক সময় ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হয়।”

প্রস্তাবটি লুফে নিল বরুণ। পাহাড় বলতে কোন অঞ্চলটাকে বোঝাতে চাচ্ছে নাথনু, তা’ জিজ্ঞাসাও করল না। মোদ্দা লাভ তার হবেই, পল্লীটির আশেপাশে কি আছে তা’ তার দেখা হোয়ে গেছে। দূর পাহাড়ের মধ্যে কি আছে তা জানা হয়নি! সেই সন্ধ্যোগটি এসে গেল।

শিকারে যাবার তোড়জোড় শুরু হোল।

ইতিমধ্যে ঘটল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। ডাকাত পড়ল বাড়িতে একদিন রাতে ছাত্তের ওপর থেকে দেখতে পেল বরুণ সেন, হেডলাইট নিভিয়ে ছ'খানা লরি এসে থামল গেটের সামনে। অনেকগুলো মানুষ লাফিয়ে নামল লরি থেকে। গেটের সামনে অল্প একটু ধস্তাধস্তি হাঁক ডাক শোনা গেল। দরোয়ান ছ'জনকে কাবু করে ডাকাতরা ভেতরে এসে পৌঁছল। নিমেষের মধ্যে অদ্ভুত একটা মতলব খেল গেল ওর মগজে, তীরবেগে দোতলায় নেমে বন্দুকটা আর কার্তুজগুলো নিয়ে সরে পড়ল। বাড়ির পেছন দিকে দেওয়ালের গায়ে ছাত্তের জল নামবার পাইপ ছিল কয়েকটা, সেই পাইপ বেয়ে নিচে নামল। পর মুহূর্তেই উধাও। বাঁশঝাড় শুরু হয়েছে ছোট্ট একটা ডোবার ওপার থেকে। সেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিলে কে তাকে খুঁজে পাবে।

ডাকাতরা কিন্তু কাউকে খোঁজাখুঁজি করবার চেষ্টাই করল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে নিজেদের কাজ গুছিয়ে চলে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক কাটাতে হোল বরুণকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে, সেখানে বসেই সে লরি ছোট্টোর চাপা গর্জন শুনতে পেল। আরও মিনিট দশেক চুপচাপ থেকে বেরিয়ে পড়ল, সাবধানে বড় বড় গাছগুলোর অন্ধকার তলা দিয়ে এগিয়ে গেল গেটের কাছে। লরি ছ'খানা চলে গেছে, হাত পা মুখ বাঁধা দরোয়ান ছ'জন গেটের পাশে ছোট ঘরের ভেতর গাদাগাদি করে পড়ে রয়েছে।

মুক্তি দিল তাদের, মুক্তি পেয়েই হাউমাউ করে চৈঁচাতে চেষ্টা করল তারা। বরুণ বাধা দিল। বলল—“চৈঁচামেচি কোর না, চৈঁচামেচি করে লাভ নেই। মিছিমিছি লোকজন জুটে বাকী রাতটা হট্টগোল করবে। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। ওধারে গিয়ে দেখা যাক, কি তারা নিয়ে গেছে।”



ছ'জন দরোয়ানই বলল যে খুব ভারী একটা সিন্দুক গোছের কিছু নিয়ে গেছে ডাকাতরা। দশবার জন লোক সেটাকে বয়ে এনে লরিতে তুলেছে। ওদের চোখ খোলা ছিল, তাই সব দেখতে পেয়েছে। সেই একটা জিনিষ ভিন্ন অন্য কিছুই আনে নি।

সিন্দুক! লোহার সিন্দুক! লোহার সিন্দুক ছিল নাকি বাড়িতে!

কে জানে কোন ঘরে কি আছে বা ছিল। এ পর্যন্ত দেখবারই সুযোগ হয়নি বাড়ির কোন ঘরে কি আছে! দাছু মারা গেল, কাজ-কর্ম চুকল, কর্তারা দরজায় দরজায় তাল ঝুলিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন। চাবিগুলো দিয়ে গেলেন না তাকে, চাবি দিয়ে গেলে সর্বস্ব যেন সে পাচার করে ফেলত। বেশ হয়েছে, ডাকাত পড়ে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। কি যে নিয়ে গেছে তাও জানা যাবে না।

যাই হোক, কর্তব্য কর্মগুলো তাকে সারতেই হবে। কারণ সে হচ্ছে জ্ঞানপ্রকাশ সেনের সাক্ষাৎ নাতি এবং তার ওপরেই বাড়ির ভার রয়েছে। অতএব দরোয়ানদের হুকুম করল আলো জ্বালাবার। গেটের পাশের ঘরে একটা হারিকেন জ্বলে, সেটাকে নিভিয়ে দিয়ে গেছে ডাকাতরা। জ্বালানো হোল। দরোয়ানদের কাছে টর্চ ছিল, টর্চ জ্বলে হারিকেন হাতে নিয়ে চলল তিনজন। বাড়ির সামনের দরজায় ঠেলা দিয়ে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। আরও গোটাকতক দরজা আছে, আলো হাতে ঘুরতে লাগল বাড়ির চার ধারে, প্রত্যেকটা দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখতে লাগল। কি আশ্চর্য কাণ্ড—প্রত্যেকটি দরজাই যে ভেতর থেকে বন্ধ!

দরোয়ান ছ'জন হতভম্ব। ডাকাতরা কি তা'হলে বাড়ির ভেতর ঢোকেনি! ছোট সাহেবই বা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কোন দরজা দিয়ে।

ছোট সাহেব ওদের মনের ভাবটা বুঝতে পারলেন। বললেন—  
“চল পেছন দিকে, কোন পথে আমি বেরিয়েছি বাড়ি থেকে তোমাদের

দেখাব। জেগেছিলাম আমি, লরি ছ'খানা এসে থামল গেটের সামনে, ওরা নামল লরি থেকে, সমস্ত দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেই বন্দুকটা নিয়ে সরে পড়েছিলাম। লুকিয়ে ছিলাম বাঁশঝাড়ের ভেতর, লরি ছ'খানা চলে গেল, আওয়াজ শুনলাম। তারপর বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে গিয়ে তোমাদের মুক্তি দিলাম।”

বাড়ির পেছন দিকে দরোয়ানদের নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ের নলটা দেখালেন। শুধু নলটাই দেখালেন না, সঙ্গে সঙ্গে ছ'হাত ধরে দেওয়ালের গায়ে ছ'পায়ের ঠেলা দিতে দিতে উঠে পড়লেন ছাতের ওপর। সেখান থেকে চাপা গলায় হুকুম দিলেন ওদের সামনের দরজায় যাবার জন্তে। নেমে গিয়ে এখনই দরজা খুলে দেবেন।

হতভম্ব দরোয়ান ছ'জন মনিবের হুকুম অনুযায়ী সামনের দরজায় পৌঁছল।

নিঃশব্দে তিনজন ঘুরতে লাগল, ওপর তলা নিচে তলা সমস্ত দেখা শেষ হোল। যেমন ছিল তেমনিই আছে। সব ঘরে তালা ঝুলছে। নিচে শচীর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ, ওধারে তার নিজের ঘরের কপাট হাট হোয়ে রয়েছে। তার মানে ডাকাতরা কি তা'হলে বাড়ির ভেতর ঢোকেই নি। উঠোন রোয়াক দালান সিঁড়ি কোথাও একটুও পায়ের ছাপ পড়েনি। অতগুলো মানুষ যদি ঢুকত বাড়িতে কোথাও না কোথাও পায়ের ছাপ দেখা যেত। মেঝে থেকে এক বিষত উঁচুতে টর্চ ধরে তন্নতন্ন করে দেখা হোল, না নেই, কোথাও একটু পায়ের ছাপ বা এমন কিছু দেখা গেল না যা থেকে সন্দেহ হোতে পারে যে ডাকাতরা বাড়ির ভেতর এসেছিল।

তা'হলে! তা'হলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কিছু নিয়ে গেছে। অত বড় বাগান অত ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কি লুকনো ছিল কে বলতে পারে!

অতএব তখনকার মত ছুটি দিল দরোয়ানদের। সাবধান করে দিল,



তারা যেন কারও কাছে কিছু না বলে। কয়েকটা দিন মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে। তা'হলেই ঠিক জানতে পারা যাবে কারা এসেছিল বাড়িতে, কি নিয়ে গেছে।

দরওয়ানদের বিদেয় করে ওপরে উঠে গিয়ে দিল যন্ত্রটা চালিয়ে। দেখা যাক, শচীনন্দন কিছু বলেন কিনা। রাত তখনও ঘণ্টা তিনেক আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে শোনবার চেষ্টা করল কিছু বলছে কিনা শচী। টু শব্দ না, একঘণ্টায় এতটুকু আওয়াজও করেনি। বাকী রাতটুকুর জন্তে আবার চালু করল যন্ত্র, ভোরের দিকে হয়তো কিছু বলতে পারে। যন্ত্রটা চালু করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল মল্লিকার মায়ের চোঁচামেচির চোটে। দরজা খুলে দেখল গোপীনাথ মল্লিকার মা দরওয়ান দু'জন ওপরে এসে জুটেছে। সংবাদ মনোরম, শ্রীশচীনন্দন সামন্ত অন্তর্ধান করেছেন।

সকালে মুখ ধোবার জল দিতে গিয়ে মল্লিকার মা দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনও দিন বন্ধ থাকে না দরজা, সে খুব আশ্চর্য হোয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে আবার এসে দেখল তখনও দরজা বন্ধ। তারপর গোপীনাথ এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। কোনও সাড়া শব্দ নেই। তখন ওরা দরওয়ানদের ডেকে আনে! দরওয়ানদের গায়ে জোর আছে। দুই জোয়ান পিঠ দিয়ে চাপ দিল দরজায়, ভেতরের খিল উপড়ে গেল। ভেতরে গিয়ে ওরা দেখল বিছানা খালি। তখন ছুটতে ছুটতে সবাই ওপরে এসে ওর ঘুম ভাঙিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ছুটল নিচে, শচীনন্দনের ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সব ঠিক আছে। যেখানে যা ছিল সব আছে, স্রেফ মানুষটা নেই।

তাজ্জব কাণ্ড যাকে বলে, ভেতর থেকে খিল আঁটা দরজা, খিল উপড়ে এরা ঘরে ঢুকেছে। তা'হলে কোন পথে লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে!

প্রত্যেকটি জানলা টেনে টেনে দেখল, একটাও উপড়ে এল না।  
মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো জানলায়, সব কটা গরাদ  
ঠিক আছে। তা'হলে সুড়ঙ্গ আছে, হয় দেওয়ালের গায়ে কিংবা  
মেঝের, সুড়ঙ্গ আছেই। পাখী হোয়ে অতবড় দেহটা হাওয়া  
আসবার ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যায়নি।

দেওয়ালের গা মেঝে সব বাজিয়ে বাজিয়ে দেখা হোল। ফাঁপা  
চাপচাপে শব্দ পাওয়া গেল না।

তা'হলে।

যার জন্তে ঐ বাড়িতে পড়ে থাকাসেই শচীনন্দন ফাঁকি দিয়ে সরে  
পড়ল। পহেলা নম্বরের বেকুব বনল বরুণ সেন। বেকুব বনে গেল  
বলে নিদারুণ রাগ হোল নিজের ওপর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,  
এই ব্যাপারটার এস্পার ওস্পার না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে ঐ  
বাড়ি থেকে নড়ছে না।



সুসংবাদটি তখনই কর্তাদের কাছে পাঠানো প্রয়োজন। ঐ কর্মটি করতে যত দেরি হবে অপরাধের মাত্রা তত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত হয়তো রায় বেরবে যে শতীনন্দনের অন্তর্ধানের জন্তে বরুণই দায়ী। ঠিক সময় যদি সংবাদটা পাঠাত তা'হলে ওঁরা তিন ভাই ছুটে এসে উদ্ধার করতে পারতেন ওঁদের শচীকে। তুই বরুণ কালকের ছেলে, কেন কিসের জন্তে কোন অধিকারে তুই অতবড় খবরটা চেপে গেলি? অতএব যে ভাবে পার যেখান থেকে পার, বার কর শচীকে, কোনও বাজে অজুহাত শোনা হবে না।

বাবা কাকারা সর্ব বিষয়ে একমত। শচীর ব্যাপারে তো বটেই। শচী হচ্ছে যার নাম—ওঁদের মহামায়া পিতৃদেবের একমাত্র বিশ্বাসী লোক, শচীর চেয়ে আপন জন ওঁদের আর কেউ নেই। শচীকে খুয়িয়ে কিছুতেই ওঁরা মুখ বুজে থাকবেন না।

প্রথমে ভাবল, দূর ছাই এতবড় বুঁকিটা কাঁধে না রাখাই উচিত। খানকতক টেলিগ্রাম করে দিয়ে চলে যাই বন্ধে, একটি বার জাহাজে চড়তে পারলেই আপদের শান্তি হবে। যা করা প্রয়োজন, সেন মশায়ের দিকপাল ছেলেরা এসে করুন।

পরমুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল মগজ। পালাব! বরুণ সেন পালিয়ে যাবে! পহেলা নব্বরের বেকুব বনে গিয়ে বরুণ সেন পালাল লেজ গুটিয়ে, এই বারতা দিকে দিকে রাষ্ট্র হবে। তারপর!

চোখের সামনে ভেসে উঠলো তিনটি মুখ, মুক্তা তরুণ অরুণ, তার

তিনটি ভাই বোন। ওরা বিশ্বাস করে ওদের দাদা সর্বশক্তিমান, দাদার ওপর ওদের অগাধ আস্থা। সেই দাদাকে ঠকিয়ে শচীনন্দন ভেগেছে। তারপর দাদাটিও শচীনন্দনকে উদ্ধার না করে সরে পড়েছে!

কি ভাবে ওরা! আবার যখন ওদের সঙ্গে দেখা হবে তখন ওরা কেমন ভাবে দাদার পানে তাকাবে!

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি কি মনে করবেন! সেই এম আর সি পি, এফ আর সি এস ডাক্তার সাহেবটি এই সুখবরটি শুনে কি ভাবে মুখ মুচকে হাসবেন, তা' যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। ছোটকাকার সেই গা জ্বালানো হাসিটি মনে পড়তেই সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল।

যে হাসিবে হাসুক, হাসিবে পুরন্দর, সেই ব্যাটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর।

সুতরাং চলল আবার শচীনন্দনের ঘরখানা ভাল করে পরীক্ষা করতে। দরজায় খিল আঁটা রইল ভেতর থেকে, সুড়ঙ্গ নেই ঘরে, জানলাগুলো সব ঠিকঠাক আস্ত রয়েছে, লোকটা তা'হলে বেরুল কেমন করে!

ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম খিলটার ওপর নজর পড়ল। পড়ে রয়েছে মেঝেয়, ভাঙেনি। খিল আটকাবার জন্তে দরজার দু' পাশে দুটো লোহার দ ইঞ্চুপ দিয়ে আঁটা ছিল, তার একটা উপড়ে গেছে। দ'টা পড়ে আছে দরজার কাছেই, যেখানকার যা সব ঠিক আছে। মানা করেছিল ওদের কোনও জিনিষে হাত দিতে, তাই কোনও কিছু নড়েচড়েনি।

খিলখানা রয়েছে, দ'টা রয়েছে, ইঞ্চুপ দুটো গেল কোথায়!

খোঁজা শুরু হোল। খাটের তলা আলমারির তলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে দুটোকে পাওয়া গেল না। তাজ্জব ব্যাপার!

খাট আলমারি একখানা ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার, এই আসবাবপত্র ঘরে। আলমারিতে তালা ঝুলছে। চাবি কোথায়!



বিছানাটা উলটে পালটে দেখা দরকার। চাবিটা হয়তো তোশকের তলায় বা বালিশের নিচে থাকতে পারে।

পাতলা কন্বল একখানা আর মাথার বালিশ দুটো পড়ে আছে বিছানায়। সেগুলো তুলে চেয়ারের ওপরে রাখল। তারপর তোশকটা উলটে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল আওয়াজ, কি যেন ছিটকে পড়ল মেঝেয়। এধার ওধার তাকাতেই দেখতে পেল ইকুপ দুটো। লাফ মেরে গিয়ে তুলে নিল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে ভেজিয়ে দিল একখানা কপাট, দেখতে পেল দুটো গর্ত। ইকুপ দুটোকে গর্তে ঢুকিয়ে দেখল, ঠিক আছে। এই দুটো দিয়েই দ'টা আটকানো ছিল বটে।

কিন্তু বিছানার ওপরে গেল কি করে ইকুপ দুটো!

ধাক্কার চোটে অত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েছে! দুটো ইকুপই চলে গেল বিছানার ওপর! আশ্চর্য কাণ্ড তো! দরওয়ানদের গায়ে শক্তি আছে বলতে হবে।

আলমারিটা খুলে ভেতরে কি আছে দেখা উচিত। চাবিটা কিন্তু পাওয়া গেল না। তালাটা ভাঙতে হবে, একটা লোহার সিক বা সরু একটা কিছু লোহার জিনিষ চাই। ছোট্ট পেতলের তালা, সিক ঢুকিয়ে চাড়া দিলেই খুলবে। চলল ঘরের বাইরে উপযুক্ত জিনিষ খুঁজতে। বেরবার সময় ভেজানো কপাটখানা ধরে টান দিল, এতটুকু নড়ল না। আবার একবার খুব জোরে হেঁচকা টান দিল, কিছুই হোল না। একখানা কপাট খোলা রয়েছে, বাইরে বেরিয়ে এসে বন্ধ কপাটখানায় গোটা দুই লাথি লাগাল। তারপর ধাক্কা, শরীরের ডান পাশ দিয়ে চাপ দিল কয়েক বার, মোক্ষম ভাবে আটকেছে, এক চুল ফাঁক হোল না।

সন্দেহ হোল তখন, যে কপাটখানা খোলা ছিল সেটার তলায় আর মাথায় হাত দিয়ে দেখল। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিজের

হাতখানার পানে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। হাঁ, তারিফ করতে হয় বুদ্ধির। মানতেই হবে যে শচীনন্দনের পেটে প্রচুর পরিমাণে বুদ্ধি আছে। সাংঘাতিক জাতের আটা লেপেছে কপাট ছ'খানার মাথায় আর তলায়। লেপে কপাট টেনে দিয়ে সরে পড়েছে। আগেই ইকুপ ছোটো খুলে দ'টাকে আর খিলটাকে মেঝেয় ফেলে রেখেছিল, ধাক্কার চোটে কপাট খুললেই মনে হবে যে দ'টা উপড়ে গেছে। সবই ঠিকঠাক করেছিল। ইকুপ ছোটোকে বোধ হয় ভুলে ফেলে গিয়েছে বিছানায়। ইকুপ ছোটোকে পাওয়া না গেলে কপাটখানা ভেজিয়ে মিলিয়ে দেখবার দরকার হোত না, ফলে শচীনন্দনের চালাকিটাও এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ত না।

যাক, এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল। শচীনন্দন যে সরে পড়েছেন, এটা প্রমাণ হোল। এবং ঘরের দরজা দিয়ে সশরীরে বেরিয়ে গেছেন, এ সম্বন্ধেও আর কোন সন্দেহ রইল না।

এখন জানতে হবে কেন গেলেন। কেন গেলেন জানতে পারলেই কোথায় গেলেন জানাটা হয়তো শক্ত হবে না। আলমারিটা খুলে দেখা দরকার। এমন কিছু হয়তো পাওয়া যাবে আলমারির ভেতর যা থেকে শচীনন্দনের পালিয়ে যাবার কারণটি জানা যাবে। অতএব একটা সিক-টিক গোছের কিছু খুঁজে আনা চাই।

তাল ভেঙে আলমারি খুলে কিছুই পাওয়া গেল না। বহুদিনের পুরনো কয়েকখানা পাতলা পাতলা খাতা রয়েছে নিচের থাকে। উলটে পালটে দেখলো পাতাগুলো, মিস্ত্রী মজুরদের হিসাব লেখা রয়েছে। তারিখ নেই, বার লেখা হয়েছে। কোন বারে কত জন মিস্ত্রী কটি মজুর কাজ করেছে, সব সুদ্ধ কত দেওয়া হয়েছে তাদের, বারের নাম লিখে তার পাশে সেই হিসাব লেখা রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন তাদের টাকা দেওয়া হয়নি। সাত দিন পরে পরে থোক টাকাটা খরচ লেখা হয়েছে একজনের নামে। মারফত সুখদেও



মিশির এত টাকা। সব টাকাই সুখদেও মিশির মারফত দেওয়া  
হোয়েছে। সুখদেও মিশিরটি কে !

খুব সম্ভব ঠিকাদার। সুখদেও মিশির হয়তো ঠিকা নিয়ে বাড়িখানা  
সারিয়েছিল। গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। দাছর সঙ্গে  
এখানে এসেছে গোপীনাথ, ও হয়তো সুখদেওকে চিনতে পারে।

ভাল করে আলমারির ভেতরটা দেখে নিয়ে খাতাখানি গুছিয়ে  
নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। কি ভেবে খোলা কপাটখানাকেও টেনে বন্ধ  
করে দিল। তারপর খাতাগুলো নিয়ে ওপরে উঠল। ভাল করে  
দেখা দরকার, খাতাগুলো থেকেই হয়তো এমন কিছু পাওয়া যাবে যা  
থেকে শচীনন্দন মহারাজের পেছনে ধাওয়া করা সম্ভব হবে।

কেন এ ভাবে ভাগল শচী সেইটুকু জানাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সারাটা দুপুর খাতাগুলো নিয়ে কাটল। সুখদেও মিশির নামটি  
ছাড়া আর কিছুই পেল না। ছ' বার গোপীনাথ এসে স্নান করবার  
জন্তে তাগাদা দিল, 'গোপীনাথকেও কিছু জিজ্ঞাসা করল না। সন্দেহ  
করতে পারে নানা রকম, গোপীনাথ মল্লিকার মা দরোয়ান ছ'জন  
কাউকে বিশ্বাস নেই।

প্রায় তিনটের সময় স্নান করে খেতে বসল। খাওয়ার পরে একটু  
ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। রাত্রে ডাকাত পড়ার দরুণ ঘুম হয়নি।  
সন্ধ্যার আগে চা দিতে বলে শুতে চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক পরেই আবার ধাক্কা পড়ল দরজায়। গেট থেকে  
একজন দরোয়ান এসে ডেকে তুলল। গাঁ থেকে পাঁচশ' জন লোক  
দেখা করতে এসেছে। তারা বলছে যে হুজুর তাদের সঙ্গে শিকারে  
যাবেন। পাহাড়ে কোথায় ভাল্লুক বেরিয়েছে, তৈরী হোয়ে এসেছে  
সবাই। দরোয়ানেরা তাদের ভাগাবার চেষ্টা করেছিল, হুজুরের সঙ্গে  
দেখা না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরবে না।

হুজুর ছুটলেন, গেটে গিয়ে দেখলেন নাথক্স এসেছে, ওর সঙ্গে

আবার চারজন সাঁওতাল এসেছে। বাগদীদের অটলবিহারী আর অটলবিহারীর ভাইপো কুঞ্জবিহারী এসেছে। সকলের চেয়ে বড় অটলবিহারী, বয়েস অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট হবেই। পাকা শরীর, মুখখানা বীভৎস। মুখখানার ঐ রকম দশা করেছে একটা ভাল্লুক, ভাল্লুকটার সঙ্গে হাতাহাতি লড়েছিল অটল। সে হোল অনেক কাল আগের ঘটনা, অটল তখন দেড় কুড়ি বছরের জোয়ান। তারপর আরও প্রায় দেড় কুড়ি বছর কাবার হয়েছে, দেড় কুড়ি বছর ধরে সমানে শিকার করেছে অটল। কোথাও ভাল্লুক বেরিয়েছে শুনলে ও ঘরে বসে থাকতে পারে না। সবাই জানে ভাল্লুকের হাতেই ও একদিন মরবে।

ওরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র এনেছে। তীর ধনুক বর্শা আর লম্বা লম্বা রামদা। রামদাগুলো দেখলে চোখ ঝলসে যায়, এমন ভাবে ধার দিয়েছে যে অনায়াসে দাড়ি কামান যেতে পারে।

প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছোট একটি পুঁটলি, পুঁটলিতে আছে ভাত। সারা রাত থাকতে হবে, তাই খাদ্যবস্তু সঙ্গে নেওয়া চাই। বরুণও কিছু বিস্কুট সঙ্গে নিল। একটা রাত বিস্কুট খেয়েই কাটবে। কে আর তার জন্তে আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবার বানিয়ে দিচ্ছে।

মল্লিকার মা গোপীনাথ আর দরোয়ানদের সজাগ থাকতে বলে নিজের ঘরে তাল বন্ধ করে বেরুল। দোনলা বন্দুক কাতুজের বেণ্ট, বড় টর্চলাইট একখানি ছোরা আর একটি জলের জায়গা, মালপত্র নেহাৎ কম হোল না। অটলবিহারী বলল, বড় জোর তিন ক্রোশ বা সাড়ে তিন ক্রোশ যেতে হবে। ঘণ্টা দু'য়েক দিন রয়েছে তখনও, অন্ধকার হবার আগেই পাহাড়ে পৌঁছন যাবে। যেখান থেকে খবর এসেছে ভাল্লুকের, সেটা একটা গ্রাম। কয়েক ঘর লোক বাস করে সেই গ্রামে। ঘণ্টা দেড়েক অন্ধকারে চলতে হবে পাহাড়ের মধ্যে, সেই পাহাড়ী গ্রামে পৌঁছবার জন্তে। সেই গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিয়ে ভাল্লুকের খোঁজ করা যাবে।

রওয়ানা হোল। গেটের সামনের পথ ধরে আধ ঘণ্টাটুকু দক্ষিণ



দিকে হাঁটবার পর বাঁ ধারের ক্ষেতে নামতে হোল। তারপর সোজা পূব দিকে যাত্রা। বহু দূরে পাহাড় আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটা কালো রেখা! ঐ পাহাড়, বহুবার নজরে পড়েছে। সত্যি সত্যিই চলল এবার পাহাড়ে, ভাল্লুক না মিলুক পাহাড়টার সঙ্গে চেনাপরিচয় হবে।

নাথনু বলল—“পাহাড়ে যাবার একটা ভাল রাস্তা আছে। সেই রাস্তায় লরি চলে। লরিতে কাঠ আসে পাহাড় থেকে, তাই রাস্তাটা চলে গিয়েছে সোজা ষ্টেশনে।”

অটলবিহারী বলল—“ফেরবার সময় লরি পাওয়া যেতে পারে। লরি পাওয়া গেলে আমরা ষ্টেশনে চলে যাব। ষ্টেশন থেকে পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফেরা যাবে।”

বরুণ বলল—“ষ্টেশন পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা যদি হয় তা’হলে আর হেঁটে ফিরতে হবে কেন। আট জন লোক আমরা, ছ’খানা গাড়িতে দিব্যি আসা যাবে।”

গাড়ি মানে একা জাতীয় ব্যাপার, ঘোড়ায় টানে। ছ’খানা চাকার ওপর বাঁশ বা কাঠের তৈরী ছোট্ট একটা মাচা। মাল বয়, দরকার পড়লে মানুষও বয়। জ্ঞানপ্রকাশের আদ্যের সময় সেই অপূর্ব যান কয়েকখানা মাল মানুষ টেনেছে।

অটলবিহারী দুর্বোধ্য ভাষায় গজগজ করে কি যেন বলল।

বরুণের খুব কাছেই ছিল নাথনু। আর একটু সরে এসে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় চুপি চুপি বলল—“লোক গুণছ কেন? শিকারে যাবার সময় লোক গুণতে নেই, গুণলে ফেরবার সময় কম পড়ে।”

একটু চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই মনে মনে হাসল, ছনিয়ায় কত জাতের কুসংস্কারই না আছে!

ক্রমেই রদ্দুর লাল হয়ে উঠেছে। চষা ক্ষেত শেষ হয়ে গেছে

অনেকক্ষণ, ছোট বড় লাল পাথরের টাই ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে, ঠকর খাবার ভয়ে সাবধানে চলতে হচ্ছে। প্রত্যেকের সামনে লম্বা লম্বা ছায়া, অনেক আগে যেন এগিয়ে রয়েছে ছায়াগুলো, ওরা সবাই ছায়াগুলোকে অনুসরণ করছে। অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে পাহাড়, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বড় বড় গাছ। পাহাড়টার গা'নয় গাছ, গাছগুলোর দরুণ পাহাড়টাকে দূর থেকে কালো দেখায়। চড়াই শুরু হয়েছে, বেশ একটু হাঁফ ধরেছে যেন। হাত ঘড়িটার পানে তাকিয়ে দেখল, প্রায় দু'ঘণ্টা সমানে পা চালাচ্ছে। এখন একটু বসলে হয়। কিন্তু বসবার কথাটা এদের কাছে বলা কি ঠিক হবে!

জায়গাটা সাপের রাজত্ব, অটল সাবধান করে দিয়েছে। পাথরগুলোর আনাচে-কানাচে নাকি বিস্তর সাপ আছে, বাগে পেলো ছোবলাতে পারে। আলো কমে আসছে, অন্ধকার হবার আগে পাথুরে জমিটা পার হোতে পারলে হয়।

ছুটি সাঁওতাল ছোকরা সকলের আগে আগে চলেছে। হঠাৎ তারা শিস দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড পাখি বিরাট দুই ডানা মেলে উঠে পড়ল আকাশে। স্পষ্ট দেখা গেল একটা লম্বা সাপ তার দু'পায়ে ঝুলছে।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা চলবার পর পাথর কমে এল। শুরু হোল ছোট ছোট ঝোপ, সামনের গাছগুলোকে তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে, পেছন দিকে সূর্যদেব তলিয়ে গেছেন।

কাজটা ভাল হোল কিনা ভাবছে তখন বরুণ। ছুট করে এই লোকগুলোর সঙ্গে না বেরুলেই হোত। বনে জঙ্গলে যারা শিকার করে বেড়ায়, তাদের সম্বন্ধে আর তাদের সাংঘাতিক সাহস সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছে বটে, কিন্তু নিজে কখনও বন্দুক ঘাড়ে করে শিকার করতে বেরোয় নি। অন্ধকার ঐ গাছগুলোর ভেতর দিয়ে চলতে হবে, অবশ্য তার কাছে টর্চটা রয়েছে। সঙ্গীরা তো আলোও আনেনি, তার মানে অন্ধকারে চলতে ওরা অভ্যস্ত। কিন্তু অন্ধকারে গুলি



করবে কেমন করে সে! জন্তু জানোয়ার দেখতে না পেলে আলো-  
পাথারি গুলি চালাবে নাকি!

গলা খাটো করে নাথনুকে জিজ্ঞাসা করল—“আলোর কি  
ব্যবস্থা করেছ তোমরা?”

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে পড়ল নাথনু, বলল—“আলো! আলো  
কি হবে!”

“মানে ভয়ানক অন্ধকার হয়ে যাবে তো একটু পরে তাই  
বলছিলাম—”

“অন্ধকার না হোলে শিকার আসবে কেন কাছে? যতক্ষণ আলো  
আছে ততক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমাদের সবাই। আমাদের  
দেখে তফাতে পালাচ্ছে।”

“কিন্তু অন্ধকারেও তো ওরা দেখতে পায়।”

“তা’ পায়। দেখতে পায়, এতটুকু শব্দ হোলে শুনতে পায়।  
সব চেয়ে বড় বিপদ, অনেক দূর থেকে মানুষের গন্ধ পায়।”

“তা’হলে? ওরা আমাদের দেখতে পাবে, অথচ আমরা ওদের  
দেখতে পাব না।”

বিচিত্র একটু শব্দ করে নাথনু একটু হেসে উঠল যেন। তারপর  
ভয়ানক রকম দুর্বোধ্য ভাষায় কি কতকগুলো বললে অটলকে, অটলও  
কিছু কিছু জবাব দিল। তারপর দেখা গেল, কুঞ্জবিহারী ঠিক ওর  
পেছনে পেছনে হাঁটছে। এক হাত সামনে নাথনু এক হাত পেছনে  
কুঞ্জবিহারী, বরুণ বুঝল আলোর কথাটা তোলা খুবই বোকামি  
হোয়ে গেছে।

একটু পরে নাথনু বলল—“আমাকে ঠিক দেখতে পাবে তুমি,  
যতই অন্ধকার হোক তু’ চার হাত পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।  
আমি তো তোমার সামনেই আছি।”

পেছন থেকে কুঞ্জ বলল—“আমি রইলাম পেছনে। আমরা তিন-  
জনে একসঙ্গে থাকব, তার মানে অন্ধকারে কেউ হারিয়ে যাব না।”

বুড়ো অটলবিহারী অনেকটা সামনে থেকে বলল—“চুপসে চল সবাই। জঙ্গলে কথা বলতে নেই, গাছেরও কান আছে।”

গাছের কান আছে কি না কে জানে, কিন্তু জঙ্গলে শোনবার ক্ষমতা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। একটানা ঝাঁঝি পোকা ডেকে চলেছে, তার ওপর অল্প একটু আধটু অল্প জাতের শব্দ যা হচ্ছে সমস্ত ঠিকঠাক ধরা পড়ছে কানে। আধ হাত সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নাথলু যে আছে সামনে এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে। বরুণের মনে হলো, চোখ বুজে চলেছে। সত্যিই চোখ বুজে চললেও কোনও ক্ষতি নেই এমন অন্ধকার। সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ক্রমাগত চড়াই ভেঙে উঠে যাচ্ছে, এটা বেশ বুঝতে পারল। একটু থামবার উপায় নেই, থামলেই পেছন থেকে ফিসফিস করে কুঞ্জ বলছে—“চল চল, এগিয়ে চল।”

শেষ পর্যন্ত এক সময় এগিয়ে চলার শেষ হোল। মাথার ওপর একটু আধটু আকাশ দেখা যেতে লাগল। আকাশে অনেক তারা অনেক আলো। সমুদ্রের বুকে অন্ধকার রাতে আকাশে এত আলো থাকে না, তফাতটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারল।

গাছ ফুরিয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় গাছ নেই। প্রায় সমতল খানিকটা জায়গা, বেশ একটা বড় চাতালের মত। অনেক আগে আর একটা অনেক উঁচু পাহাড় বুক চিত্তিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

থামল সবাই, এতক্ষণ পরে বিশ্রাম। সবাই বসে পড়ল দেখে বরুণও বসল।

অটল বলল—“এক পোয়া রাতও হয়নি। তোমরা বস এখানে, আমি গাঁ থেকে ঘুরে আসি। ভাল্লুক বেরিয়েছে কোনদিকে জেনে আসি। তারপর সোজা সেইদিকেই যাওয়া যাবে। খামকা সবাই মিলে এতটা চড়াই উতরাই ভেঙে মরি কেন।”

“গ্রাম কোথায়?” জিজ্ঞাসা করল বরুণ।



“ঐ বড় পাহাড়ে।” হাত তুলে অন্ধকার পাহাড়টা দেখিয়ে দিলে  
কুঞ্জ।

নাথন বলল—“ঐ বড় পাহাড় থেকে সোজা রাস্তা ইষ্টিশনে গেছে।  
সেই রাস্তা দিয়ে লরি এসে পাহাড় থেকে কাঠ নিয়ে যায়।”

কুঞ্জ বলল—“মিশিরের লোকজন যদি থাকে ওখানে তা’হলে  
গোলমাল পাকাবে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে সবাই। এমন  
ছজ্জত বাধাবে যে হয়তো আমরা ধরা পড়ে যাব। নেড়ামাথাওয়ালা  
বেটারা টের পেলেই মুশকিল।”

“সেও একটা কথা।” অটল বিহারী খুবই ভাবনায় পড়ে গেল যেন।

“ঐ ব্যাটারদের এবার একদিন খতম করতে হবে”—দাঁত কড়মড়  
করে নাথন বলতে লাগল “কবে আমরা ঝামেলা মিটিয়ে দিতাম,  
বুঢ়ার জন্তে পারি না। বুধন সর্দার যতদিন বেঁচে আছে ততদিন  
ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। বুড়োর ধারণা ওরা সাধু।  
সাধু! হারামিরা শয়তান, মিশির যে সব মাল পাঠায় ওদের মঠে,  
ওরা সেগুলো পাহাড়ের ওপারে চালান দেয়।”

চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ বরুণ, এইবার খুবই আলতো ভাবে  
একটি প্রশ্ন করল “মিশির কে?”

জবাব দিল অটল “সুখদেও মিশিরের ছেলে বলদেও। জঙ্গল  
ঠিকা নিয়ে কাঠ চালান দেয়। এক নম্বরের বিচ্ছু, কাঠের কারবার  
করলে কি রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া যায়। মাসে দশ লরি কাঠও  
পাহাড় থেকে নামায় না। এখানে বড় বড় বাড়ি বানাচ্ছে, মোটর  
কিনছে। কতকগুলো পাহাড়ী শয়তানকে মদ গেলায়। দরকার  
পড়লে তারা লোকের গলায় চাকু চালাতে পারে।”

স্তব্ধ হয়ে রইল বরুণ। ওরা নিজেদের ভেতর কি সব পরামর্শ  
করতে লাগল।

অনেকক্ষণ হোল অটল গেছে। ওরা সবাই নিজের পুঁটলি খুলে ভাত

খেয়ে নিল। ভাতের সঙ্গে আর কি খেল অন্ধকারে দেখা গেল না। জল খেল না কিন্তু, সঙ্গে জল নেই। জলের কথা কেউ উত্থাপনও করল না। নাথনু জানতে চাইল, সে কি খাবে। খান দুই বিস্কুট আর এক পেট জল খাবে শুনে খুবই আশ্চর্য হোয়ে গেল। জল খাবে! জল খেলে ঘুম পাবে না!

সে কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি বরণ জলপাত্রটা মুখে তুলল। কি জানি, আলো জ্বালানো যেমন বারণ হোয়ে গেছে তেমনি জল খাওয়াটাও যদি বারণ হোয়ে যায়। খুব তেষ্ঠা পেয়েছিল তার, জল খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। বন্দুকটাকে পাশে রেখে সেখানেই আড় হোয়ে পড়ল। যতক্ষণ পারা যায় একটু আরাম করা যাক। ওরা কিন্তু বসে রইল সবাই সোজা হয়ে। মনে হোল, অন্ধকারে ছটা হিংস্র জানোয়ার ওত পেতে মুখিয়ে রয়েছে যেন, কোনওদিকে এতটুকু সাড়া শব্দ হোলেই ঝাঁপ দেবে। কেউ একটি কথা বলছে না, এতটুকু নড়ছেও না। মানুষগুলো বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল কি না ভাবতে লাগল বরণ। ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রামত এল। হঠাৎ পিঠে একটা খোঁচা লাগতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ফিসফিস করে নাথনু বলল—“শুনতে পাচ্ছ কিছু?”

কি শুনবে! সেই একঘেয়ে ঝাঁঝির ডাক ছাড়া কিছুই শোনার নেই। কানখাড়া করে নিস্তব্ধ হোয়ে রইল। কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল সেই ভাবে, তারপর পেল শুনতে। হাঁ—ঠিক শোনা যাচ্ছে। ঠুং ঠুং টিং টিং ঘন্টি বাজছে যেন, অনেকগুলো ঘন্টি একসঙ্গে বাজছে! খুবই টিমে তালে বাজছে ঘন্টিগুলো, বহুদূরে বাজছে। গলায় ঘন্টি বেঁধে একপাল গরু ছাগল চরছে নাকি। এই অন্ধকারে ছাগল গরু—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লাগল শরীরের ভেতর, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিছাৎ খেলে গেল কয়েকবার। তারপর কাঠ হোয়ে বসে শুনতে লাগল—সেই আওয়াজ! ওই আওয়াজ ভুল হবে না কিছুতেই। দাছ যখন—



আবার কেউ মরছে নাকি ! নিশ্চয়ই কেউ মরছে কোথাও, কে মরছে !

লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ওঠা হোল না। নজরে পড়ল একটা অন্ধকার মূর্তি এগিয়ে আসছে।

খুব কাছে এসে অটল বলল—“না, আজ রাতে কোনও আশা নেই। নেড়ামাথাওয়ালারা সজাগ আছে। কি যেন একটা পূজো-টুজো আছে আজ ওদের। চল সবাই, চুপি চুপি সরে পড়ি। আমরা শিকার করতে এসেছিলাম এটা যেন ওরা টের না পায় !”

আবার সেই চোখ বুজে পা চালানো। কষ্ট কিছুই নেই, চড়াই ভাঙতে হচ্ছে না। সামনে পেছনে নাথনু আর কুঞ্জ, ওরা তিনজন সবার আগে চলেছে। বাকী পাঁচজন আসছে অনেকটা পেছনে। কি একটা নেশার জিনিষ আছে অটলের সঙ্গে, শিকার যখন করা চলবে না তখন নেশা করতে ক্ষতি নেই, তাই ওরা নেশা করতে বসল। বরুণকে নিয়ে নাথনু আর কুঞ্জ রওনা হোয়ে পড়ল, নাথনু কুঞ্জ নেশা করে না। তাই ওরা তিনজন অনেকটা এগিয়ে আসছে।

বনটাকে আর তত অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে না। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের আলো ঢুকে পড়েছে। আসল কথা চোখ তখন অভ্যস্ত হোয়ে গেছে, অন্ধকারেও দিব্যি নজর চলছে। বরুণের মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে সেই ঘন্টিগুলোর শব্দ। ফিরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না ভাবছে। ঠিক হচ্ছে না, কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না ফিরে যাওয়া, এত কাছে এসে ফিরে যাবে ! না গিয়ে উপায় নেই। যাদের সঙ্গে এসেছে তাদের সঙ্গে ফিরতেই হবে। তাকে ফেলে রেখে এরা কেউ ফিরে যাবে না। তার মানে, এদের বলতে হয় মতলবটা। লামাদের মঠটা কোথায়, কি হচ্ছে সেখানে, জানতে চায়, স্বচক্ষে দেখতে চায় জায়গাটা। জায়গাটা না দেখে ফিরতে পারে না সে। মতলবটা তা’হলে খোলাখুলি এদের জানাতে হয়।

অন্য কিছু সন্দেহ করবে না তো এরা !

জিজ্ঞাসাই করা যাক মঠটা কত দূরে। জিজ্ঞাসা করতে দোষ নেই।

গলা খাটো করে বলল—“ঘটির শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। সাধুদের মঠ বোধহয় অনেক দূরে।”

নাথনু জবাব দিল—দূরে নয়। পেছনে যে পাহাড়টা দেখা গেল ঐ পাহাড়ে। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যেতে গেলে অনেকটা নেমে গিয়ে ফের চড়তে হবে। এই পাহাড় দুটোর মাঝখান দিয়ে একটা ঝরণা বইছে। সেটা পেরোতে হবে। সোজা পথ থাকলে আধ ঘণ্টার ভেতর পৌঁছনো যেত।”

“কখনও গেছ নাকি সেখানে?” নিতান্ত ভাল মানুষের মত জানতে চাইল বরুণ।

“যাব না কেন, হামেশাই আমরা যাওয়া আসা করি। কিন্তু এ ভাবে পাহাড়টা ডিঙিয়ে নয়। সেই ষ্টেশনে গিয়ে সোজা পথে হেঁটে যাই, কিংবা লরি পেলে লরিতে। চাল ডাল গম ভুট্টা আলু যা নিয়ে যাবে ওদের ওখানে ওরা কিনে নেবে। ভাল দাম দেয়, তাই অনেকেই মালপত্র ওদের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে।” অটলবিহারীর ভাইপো কুঞ্জবিহারী ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

নাথনু বলল—“আগে আমরা ভেবেই পেতাম না অত মাল কিনে ওরা করে কি। ঐ ক’জন মানুষে অত মাল খায়! ওরা কি রান্ধস নাকি! তারপর—তালে তালে থেকে ধরতে পারলাম। বড় বড় লোমওয়ালা বকরা-বকরি পালে পালে চলে আসছে উত্তরের পাহাড় থেকে, ফিরে যাচ্ছে ছোট ছোট বস্তা পিঠে বেঁধে। বেমালুম পাচার হোয়ে যাচ্ছে চাল গম ভুট্টা, আরও কত কি পাচার হচ্ছে। বলদেও মিশির লরি লরি মাল পাঠায়। শুনেছি, ওষুধপত্র কাপড় কন্বল এমন কি বন্দুক গুলি পর্যন্ত ওরা কিনে নেয়। জোর কারবার চলছে। লাল হোয়ে গেল বেটা বলদেও।”



প্রস্তাবটি হঠাৎ পেড়েই ফেলল বরুণ। চলা থামিয়ে বলল—“আমি একবার সেই মঠটা দেখতে চাই। ফিরে চললাম আমি, তোমরা যাও।”

কি যে বলবে ওরা ভেবেই পেল না, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বরুণ বললে—“চলি তা’হলে। কাল আবার এস আমাদের বাড়িতে, অনেক কথা আছে।”

অবোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে সামান্য ছুঁচরটি কথা আলাপ করল ওরা। তারপর নাথনু বলল—“একটা কথা বলছি শোন। আজ যেমন ফিরে চলেছ তেমনি ফিরেই চল আমাদের সঙ্গে। আমরা ছুঁজন সেই মঠে নিয়ে যাব তোমাকে, এমন ব্যবস্থা করে নিয়ে যাব যে অণু কেউ টের পাবে না। আজ ফিরে চল।”

“আমার কাকা এ ব্যাপারটা জানতে পারবে, এটা আমি চাই না।” বলল কুঞ্জ।

নাথনু তখন একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল “আরও চারজন মানুষ রয়েছে। সবাইকে কি বিশ্বাস করা যায়। নেড়ামাথাওয়ালারা অনেককে টাকা খাইয়ে হাতের মুঠোয় পুরেছে। আমাদের বিশ্বাস কর তুমি, আমরা তোমাকে নিয়ে গিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা সব দেখিয়ে আনব।”

“ঠিক এই সময়ে কি করছে ওরা দেখতে পোলে বড় ভাল হোত।” বলে একটা লম্বা শ্বাস ফেলল বরুণ। তারপর ওদের মতেই মত দিল। বলল—“তা’হলে চল, ফেরাই যাক। তোমরা যখন বলছ তখন—”

কুঞ্জ বলল—“আমাদের সমাজে চারটে থাক আছে জান বোধ হয়। আমি হচ্ছি প্রধান থাকের মানুষ, আমরা ব্যগ্রক্ষত্রিয়। সহজ কথায় আমাদেরই তেঁতুলে বাগদৌ বলে। কথার নড়চড় হয় না আমাদের। জিভ দিয়ে কিছু খেলে যেমন সে জিনিষটা বুটা হোয়ে যায় তেমনি একটা কথা জিভ দিয়ে বার করলেও বুটা হয়। বুটা খাবার যেমন খাওয়া চলে না, তেমনি বুটা বাতও ফের গেলা যায় না।”

পা চালিয়েছে তখন তিনজনেই। বরুণ অন্য কথা উত্থাপন করল—“তা’ ব্যগ্রক্ষত্রিয় হচ্ছে প্রধান থাক, আর তিনটি থাক কি?”

“কুশমেটে ছলে আর কাঁসাকুলে।”

“ওরা কি তোমাদের চেয়ে ছোট নাকি?”

“ছোট নয়, ছোট বড়র কথা হচ্ছে না। আমরা সবাই সমান।”

“কিন্তু তা’হলে যে বললে তোমরাই প্রধান?”

“প্রধান হচ্ছে মানে সম্মানে। আমাদের থাকের কেউ কখনও কাঁধে করে পালকি বয় না।”

বেশ আশ্চর্য হোয়ে গেল বরুণ। জিজ্ঞাসা করল—“পালকির চল এখনও আছে নাকি এখানে?”

এবার নাথলু জবাব দিল—“পালকি নয় ডুলি। ডুলি না হলে বড়ঘরের জেনানারা কিসে চড়ে যাওয়া আসা করবে। পর্দা চাই, ডুলিতে পর্দা ঘেরা থাকে, তার ভেতর বসে জেনানারা ঘুরে বেড়ায়।”

“শুধু জেনানারা নয়, অনেক বদমাশ পুরুষও ঐ ভাবে লুকিয়ে চলাফেরা করে। আমরা সব জানি, বাগদীদের কাঁধে চেপে যায়, আর বাগদীরা কিছু বুঝতে পারে না, এই হোল ওদের বিশ্বাস।” বলে কুঞ্জর দাঁত কড়মড় করে উঠল যেন।



বারটা বেজে গেছে তখন। ঘড়ির পানে তাকিয়ে মনে মনে হিসেব করল বরুণ, আর কতক্ষণ লাগবে বাড়ি পৌঁছতে। চষা ক্ষেত গুরু হোয়েছে, বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক লাগবে গেটের সামনে গিয়ে পৌঁছতে।

আর একটা কথাও মনে পড়ল। চব্বিশ ঘণ্টা হোল শচীনন্দন সরে পড়েছেন। ডাকাতরা কাল রাতে এই সময়েই এসেছিল। ডাকাতদের সঙ্গেই যদি গিয়ে থাকে শচী—

ডাকাতদের সঙ্গে গিয়েছে! ওদের সঙ্গে গিয়েছে এ কথাটা কেন সে মনে করছে!

অনেকগুলো ব্যাপার পর পর ঝাঁকি মারল মনের মধ্যে। লরি এনেছিল ডাকাতরা, লরিতে চাপিয়ে নিয়ে গেছে একটা ভারী সিন্দুক, সুখদেও মিশিরের ছেলে বলদেও মিশিরের লরি আছে! সেই লরিতে মাল চালান দেয় লামাদের মঠে, সেই মাল আবার ছাগলের পিঠে চেপে পাহাড়ের ভেতর উধাও হোয়ে যায়। শচীনন্দন লামাদের নিয়ে এসেছিল দাঙ্গুর শেষ সময়ে। শচীনন্দনের আলমারিতে যে খাতাগুলো পাওয়া গেল তাতে সুখদেও মিশিরের নাম আছে।

এতগুলো মাল মসলা দিয়ে সুন্দর একটা গল্প খাড়া করা যায়। কিন্তু গল্পটিকে নিখুঁত করতে হোলে বলতে হবে ভারী সিন্দুকে ভরে কি নিয়ে গেছে তারা। আর শচীনন্দনের হৃদিসটিও দিতে হবে। মোটের ওপর শচীনন্দনকে চাই-ই-চাই। জ্যান্ত হোক মরা হোক,

শচীবাবুর খোলটিকে ফিরিয়ে এনে সেন গুপ্তির সামনে হাজির করা চাই।  
বরুণ সেনের হেপাজতেই ছিলেন শচীনন্দন, অতএব বরুণ সেনই দায়ী।

অসহ্য, অসহ্য, লোকটা দিবি কাঁচকলা দেখিয়ে সরে পড়ল,  
এইটেই অসহ্য।

এধারে চব্বিশ ঘণ্টা পার হোতে চলল, উধাও হওয়ার সংবাদটি  
কর্তাদের কাছে পাঠানো হোল না। এই অপরাধটি কি জাতীয় অপরাধ  
তা বিলক্ষণ জানে বরুণ। যতই দেরি করবে সংবাদটি পাঠাতে ততই  
অপরাধটির ওজন বেড়ে যাবে। বাড়ুক, বাড়লেও উপায় নেই।  
শচীবাবু কোথায় গেছেন, কি করছেন, এই দুটি সংবাদ না জানা পর্যন্ত  
শ্রেফ উধাও হওয়ার সংবাদটি সে কিছুতেই পাঠাতে পারবে না।

অতএব ঠাণ্ডা মাথায় মতলব ভাঁজা যাক। বাকী রাতটুকু খরচ  
হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করা চাই। ভাল্লুক শিকার করতে বেরিয়ে  
ন' দশ ঘণ্টা খামকা নষ্ট হোল, না বেরিয়ে উপায়ও ছিল না। নাথলুকে  
কথা দিয়েছিল, কোথাও ভাল্লুক বেরিয়েছে সংবাদ পেলেই শিকারে  
যাবে। ওরা একেবারে তৈরী হোয়ে এল, তখন 'যাব না' বললে ওরা  
ভাবত কি! তা'ছাড়া শিকারে গিয়ে লাভ কিছু কম হয়নি। ভাল্লুক  
পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু বাঘ ভাল্লুক জাতীয় দামী দামী কয়েকটি  
সংবাদ পাওয়া গেছে। লামাদের ব্যাপারটা এক রকম ভুলেই গিয়েছিল।  
এখন দেখা যাচ্ছে, লামাদের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে নেওয়াই সব থেকে  
জরুরী কাজ। দাছ যতদিন শয্যাশায়ী হননি ততদিন রাত এগারটার  
পরে শচীর সঙ্গে বেরুতেন, ফিরতেন ভোর রাতে। কোথায় যেতেন দাছ!

আর একবার নিজেকে নিজে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিল বরুণ সেন  
—মনে রেখ, দাছর শেষ সময়ে শচীই লামাদের এনেছিল। শচীনন্দন  
লামারা দাছ, সবাই এক জালে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে যেন।  
জালই বটে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল অন্তিম মুহূর্তে কি বলেছিলেন  
দাছ—নৃতাত্ত্ব। ঠিক দু'বার উচ্চারণ করেছেন ঐ কথাটি। অভিধান



সঙ্গে নেই, বাড়িতেও নেই। লুতাতন্তু কথাটার মানে কি জেনে নিয়েছে অধ্যাপিকা বোনের কাছ থেকে। লুতা মানে মাকড়সা, তন্তু মানে আঁশ, লুতাতন্তু মাকড়সার জাল। মাকড়সার জালই বটে। জাল দিতে এক কোণে বসে আছে একটা মাকড়সা, একটা মাছি উড়তে উড়তে আটকে গেল জালে, মাকড়সাটা জাল বেয়ে এগিয়ে আসছে মাছিটাকে খেতে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে ভয়ানক রকম চমকে উঠল। বেচারী শচী সেই মাছি নয়ত !

মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল। কেন সে ধারণা করে ফেলেছে যে শচী ইচ্ছে করে সরে পড়েছে ! জোর করে শচীকে ধরে নিয়ে যায়নি, এ কথাই বা কে বললে !

শচীর সেই কথাগুলো—“জীবনভোর ঠকেছি, এবারও ঠকব নাকি !” বার বার আওড়ে নিলে মনে মনে। তারপর মনে মনেই নিজেকে নিজে বললে—“বরুণ সেন, হতভাগা শচী এবারও হয়তো ঠকেছে। ব্যাপারটার উলটো দিক ভেবে দেখ।”

উলটো সোজা যেদিক থেকেই ভাব, মোদ্দা ব্যাপারটা একই দাঁড়াচ্ছে। শচীনন্দনকে খুঁজে বার করতেই হবে। এবং যদি শচীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবেই। জ্ঞানপ্রকাশ সেনের নাতি বরুণ সেন কিল খেয়ে কিল চুরি করার মানুষ নয়।

ওরা চলে গেল। পল্লীটি প্রায় আধ মাইল দূরে। গেটের সামনে বুড়ো অটলবিহারী ছুঁখ প্রকাশ করল। খামকা হুজুরকে কষ্ট দেওয়া হোল, তবে খুব শিগ্গির আবার শিকারে যাওয়া যাবে। সামনেই শীত, শীতকালে হামেশা ভাল্লুক বেরোয়।

নাথলু বলল, সকালেই সে আসছে কুঞ্জকে নিয়ে। কটার সময় যুম ভাঙবে জানতে চাইল।

“আটটা, আটটার পরে এস।” বলে গেটের ভেতর ঢুকল বরুণ।

দরোয়ানরা জেগে ছিল। আলো নিয়ে একজন সঙ্গে সঙ্গে চলল। কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল তাকে—“কি খবর বল, নতুন কিছু ঘটল নাকি এর মধ্যে?”

—“না, তেমন কিছুই ঘটেনি। সন্ধ্যার আগে একজন আওরত এসেছিল মল্লিকার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, আধ ঘণ্টা পরে চলে গেছে।” বলে দরোয়ানটি হাই তুললে।

নিশ্চয়ই ওর আত্মীয়স্বজন হবে, ভেবে নিলে বরুণ। মল্লিকার মা বাগদীর মেয়ে, ওদের কোন থাক কে জানে। বেশ চারটে নাম বললে কুঞ্জ—ব্যগ্রন্থত্রিয় কুশমেটে ছলে আর কাঁসাকুলে। জিজ্ঞাসা করতে হবে মল্লিকার মাকে, কোন থাকে পড়ে সে। ওর মেয়ে জামাই নাতি নাতনী থাকে পল্লীতে, কুঞ্জও বলতে পারবে ওদের কোন থাক। খুব সুন্দর মল্লিকা এসেছিল মায়ের কাছে, কিছু নিয়ে-টিয়ে গেল। হাতটান দোষটি আছে একটু মল্লিকার মায়ের, এই সংবাদটি তার নিজের মা কয়েক বার বলেছিলেন। তা’তো থাকবেই, দিন রাত পড়ে আছে এ বাড়িতে, খাটছে খুটছে সব কিছু সামলাচ্ছে। কতই বা মাইনে পায়! এটা সেটা নিয়ে মেয়ে জামাইকে তো দেবেই।

তা নিক গে, ছ’মুঠো চাল ডাল বা ছটো আলু পটল, এ সব ছাড়া অন্য কিছু নেয় না। ওটুকু না নিলে ওর চলবেই বা কেন। দরোয়ানরা যদি নজর রাখে তা’হলে কোনও জিনিষ গেট পার হোতে পারে না! দরোয়ানদের একটু সাবধান করে দেবে নাকি!

মল্লিকার মায়ের কাছে মল্লিকাই এসেছিল। মল্লিকাকে কি চেনে না দরোয়ানরা! নিশ্চয়ই চেনে। বহুবার আসে এ বাড়িতে মায়ের কাজে সাহায্য করতে মল্লিকা। তাহলে একজন আওরত বলছে কেন!

খটকা লেগে গেল। জিজ্ঞাসা করল—“সেই আওরত কে? মল্লিকা নয় তো?”

দরোয়ান বলল, “মল্লিকা নয় অন্য কেউ এসেছিল। বড় ঘরের জেনানা বলে মনে হোল।”



“বড় ঘরের জেনানা ! অত্ৰ কোনও দিন ঐ জেনানা এসেছেন নাকি এ বাড়িতে ?”

“লম্বা ঘোমটা ছিল, মুখ দেখা যায় নি । কিন্তু এ বাড়িতে আর কোনও দিন আসেন নি তিনি, আসলে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করতেন না ।”

“কি জিজ্ঞাসা করলেন ?” জানতে চাইল বরুণ ।

“জেনানাটি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাড়িতে কোনও আঙুরত আছে কি না । মল্লিকার মা আছে শুনে ডেকে দিতে বললেন । তারপর মল্লিকার মা গেটে গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এল ভেতরে ।”

এ আবার কে রে বাবা ! হঠাৎ এক বড় ঘরের জেনানা উদয় হোলেন কোথা থেকে ! কে এসেছিলেন জানতে হচ্ছে তো ।

গোপীনাথ আর মল্লিকার মা দু’জনেই ঘুমচ্ছিল । ডাকাডাকি করে ওদের ঘুম ভাঙাতে হোল । দরজা খুলে দিয়েই ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল । তাড়াতাড়ি খাবার তৈরী করে দিতে হবে ।

জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে ঘরে গিয়ে দেখল, লুচি তরকারি নিয়ে গোপীনাথ তৈরী হয়ে আছে । খেতে বসে জিজ্ঞাসা করল—  
“কে নাকি এসেছিলেন গোপীনাথ—দরওয়ান বললে ।”

“কে ! কৈ, আসে নি তো কেউ !” হকচকিয়ে গেল যেন গোপীনাথ । পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল তার, তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“ও হাঁ হাঁ, এসেছিল তো । তুলসী এসেছিল—তুলসী—” বলতে বলতে টপ করে সামলে গেল ।

“তুলসী কে ?” গোপীনাথের চোখের পানে তাকিয়ে জানতে চাইল বরুণ ।

“সে আপনার শুনে কাজ নেই ।” বলে গোপীনাথ মুখ নামালো ।

কয়েক গ্রাস খেয়ে আবার কথা শুরু করল বরুণ—“কি জন্ম এসেছিল সে ?”

“কি জন্মে ?” গোপীনাথ এবার সাতকাণ্ড শোনাতে শুরু করলে—

“ও সব মেয়েমানুষ কি জন্তে কোথায় যায় তার কি কোনও ঠিক ঠিকানা আছে ছোটবাবু। মতলব একটা নিশ্চয়ই ছিল পেটে, সেটা কি আর আমাদের কাছে খুলে বলেছে। বললে, এতদিন নাকি কোথায় তীর্থ করতে গিয়েছিল। সব ফিরেছে। ফিরে শুনেছে কর্তাবাবু স্বর্গে গেছেন। তাই একবার দেখা করতে এল শচীবাবুর সঙ্গে। শচীবাবুর সঙ্গে কি নাকি কথা আছে। কথা তো ছাই আর পাঁশ, টাকা চাইতে এসেছিল। টাকার দরকার পড়েছে নিশ্চয়ই ঠাকরণের। কর্তাবাবু নেই, এখন আর কে ওকে মুঠো মুঠো টাকা দেবে। আমরা হচ্ছি চাকর বাকর মনিষি, আমাদের ছোট মুখে বড় কথা তো সাজে না। তাই তো বলছি ছোটবাবু, এ কাণ্ড আপনার শুনে কাজ নেই। প্রথম দিন এসেছে, কিছুই বলিনি আমি। আর একবার যদি এ বাড়ির ফটক পেরোবার চেষ্টা করেন ঠাকরণ তা’হলে টের পাবেন। আমার নাম গোপীনাথ গড়গড়ি, তিনকুড়ি বছর কত্তাবাবুর ভাত রাঁধছি। আপনার ঠাকুমা তখন বেঁচে ছিলেন, আমি কাজে লাগলাম। আপনার চেয়ে বয়েস তখন আমার অনেক কম। কি খেতে ভালবাসেন কত্তাবাবু, কতটুকু ঝাল মসলা ছুন মিষ্টি দিতে হবে ওঁর তরকারিতে, কি ওঁর সহ্য হয় পেটে, কোনটা সহ্য হয় না, সব আপনার ঠাকুমা আমার শিখিয়ে গেছেন। তা’ তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন, আগেই স্বর্গে চলে গেলেন। আমি রইলুম কত্তাবাবুর সঙ্গে। কত কি না দেখলুম ছোটবাবু এই চোখ দুটো দিয়ে। মুখ টিপে দেখেই গেলুম শুধু। চাকর বাকরের ছোট মুখে বড় কথা তো সাজে না। তা’ যাক, এখন আপনি কবে যাচ্ছেন বলুন তো ছোটবাবু। আপনি গেলেই আমার ছুটি। আপনারও তো ছুটি হোয়ে গেল এখান থেকে। শচীবাবুকে আগলে ছিলেন, শচীবাবু নিজে থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন। এখন আর শুধু শুধু আপনি এখানে বসে থাকবেন কেন?”

খুবই ভাল মানুষের মত বরণ বলল—“আমিও তাই ভাবছি। আরও দু’একটা দিন দেখি, শচীবাবু যদি না ফেরেন দু’চার দিনের



মধ্যে তা'হলে আমাকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে।”

“আমিও। আমিও ছুটি পাব।” বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল গোপীনাথ! আরও খানকয়েক লুচি দিতে দিতে বলল—“চলে যাব বিন্দাবন, বিন্দাবনে থাকলে ছুটো অন্নের অভাব হবে না। কি বলুন আজ্ঞে?”

বরুণ বললে—“বিন্দাবনে একদম অন্নই নেই। ওখানে সবই মহাপ্রসাদ। তা এত জায়গা থাকতে বিন্দাবনে যেতে চাও কেন গোপীনাথ? তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছে গেলেই পার। শেষ বয়েসটা আপনার লোকের কাছে থাকলে—”

গোপীনাথ তখনও উত্তেজিত হয়ে আছে। বরুণের পরামর্শে কানই দিলে না। বললে—“মহাপ্রসাদ! আচ্ছা মহাপ্রসাদই সই। ঐ খেয়েই দিব্যি দিন চলবে। দিনান্তে পেট ভরবার মত কিছু একটা জুটলেই হোল।”

“কিন্তু তোমার তো অনেক টাকা আছে শুনেছি। দাহুর উইলে লেখা আছে—”

কথাটা শুকে শেষ করতেই দিলে না গোপীনাথ। বললে—“সে তো আমি বলে দিয়েছি বড়বাবুকে, বড়বাবু মেজবাবু মেজবাবু সববাইকে বলে দিয়েছি, সেই টাকায় কি করতে হবে! আপনি শোনে নিন?”

বরুণের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মাথা নাড়লে সে, অর্থাৎ শোনে নিন।

গোপীনাথ বললে—“কত্তাবাবু যা দিয়ে গেছেন আমাকে তাই দিয়ে আমার দেশে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে হবে। খুব বড় একটা, ঠিক এই বাড়িতে যেমন রয়েছে তেমনি! ঘোরালেই গল গল করে জল উঠবে। গাঁয়ের বউ বি গুলো বাঁচবে। জানলেন ছোটবাবু, জল নেই। জলের জন্তে গাঁয়ের মানুষ টা টা করে মরে। সেই ছোট বেলায় ছেড়ে এসেছি গাঁ, এখন যদি সেখানে যাই, চিনতেই পারবে না।

হয়তো, গাঁয়ের মানুষও কেউ আমাকে চিনবে না। আমার নামটাও হয়তো কারও মনে নেই। তা দোষও নেই তাদের, চল্লিশ বছরের বেশী হোল গাঁ ছেড়েছি। কিন্তু মনে আছে এখনও কি ভাবে মানুষ জলের জন্তে হাহাকার করে। তাই—বুঝলেন না ছোটবাবু একটা বেশ ভাল টিউবওয়েল যদি—”

খাওয়া হোয়ে গিয়েছিল বরুণের, উঠে দাঁড়িয়ে বললে—“আমি আবার এখানে কি ঠিক করে ফেলেছি জান গোপীনাথ কাকা! ঠিক করেছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যশে চলে যাব। একলা মানুষ আমি, জাহাজে চড়ে সমুদ্র ঘুরে বেড়াই। এবার একটা ভাল চাকরি ঠিক করে নিয়ে ডাঙায় আস্তানা গাড়ব। অবশ্য তুমি যদি আমার আর আমার আস্তানার ভার নাও।”

গোপীনাথ গড়গড়ি তনুহুর্তে রাজী—“নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এর মধ্যে রাজী নারাজীর কথা উঠছে কেন। ছোটবাবু যদি কোথাও বাসা করেন গোপীনাথ সেই বাসার ভার তো নেবেই! তারপর ছোটবাবু বিয়ে করে বউ আনলে—”

বরুণ বেরিয়ে গেল হাত ধুতে। বলতে বলতে গেল—“সেই বউ তখন তোমায় রেঁধে খাওয়াবে।”

নতুন একটি নাম—তুলসী। নামটি কিন্তু বেশ। মনে মনে একটি চুমকুড়ি দিলে বিছানায় শুয়ে। তা’হলে বোঝা গেল যে দাছুটি নেহাত শুষ্ক কাষ্ঠ ছিলেন না। তাইতো বলি বাবা, জাঁদরেল তিন ছেলে থাকতে একলা এই নিরালায় ঘাপটি মেরে ছিলেন কেন! বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। আহা আহা আহা রে—বানপ্রস্থে তুলসী গঙ্গাজল ইত্যাদি সব পবিত্র দ্রব্য চাই-ই-চাই।

তুলসীকে একটিবার চর্মচর্মে দেখতে পেলে হোত। সে সৌভাগ্য কি হবে!

নিশ্চয়ই যথেষ্ট বয়েস হোয়েছে। নেহাত কচি খুকীটি যে নন



তুলসী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই থান পরে থাকেন, থান হয়তো গরদেরও হোতে পারে। বেশ গিল্লীবানী গোছের একটি বয়স্কা বিধবা ভদ্রমহিলা, গলায় মালা পরে রয়েছেন। মালা হয়তো ঐ তুলসীরই মালা। গায়ে গতরেও বেশ ভারী। তবে হাঁ, রঙ মুখ চোখ দেখে বোঝা যায় যে বয়েস কালে তুলসী নেহাত হেলাফেলার জিনিষ ছিলেন না, কালো কুৎসিত হাড় চামড়া সার নিশ্চয়ই নয়। মাগুবর জ্ঞানপ্রকাশ সেনের রুচি ছিল, এটা তার অতিবড় শত্রুও মানে। সুতরাং তুলসীকে দেখে নিশ্চয়ই চোখ করকর করবে না।

তুলসীর রঙ রূপ বয়েস এবং শরীরের ওজন সমস্ত ঠিক করে ফেলল বরুণ সেন। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে ফেললে যে একটিবার তুলসীকে না দেখে কিছুতেই সে স্থানত্যাগ করবে না। তুলসী ঠাকরুণ হচ্ছেন যাকে বলে তার ঠানদি। আসল ঠানদি যিনি ছিলেন তাঁর শুধু ফোটোই দেখেছে। নাতির মুখ না দেখেই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। এখন যখন এক নকল ঠানদির সন্ধান পাওয়া গেল তখন কোন প্রাণে সে ঠানদির সঙ্গে একটিবার মোলাকাত না করে যেতে পারে।

সব চেয়ে বড় কথা, ঠানদি এসেছিলেন শচীবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অর্থাৎ শচীবাবুর সঙ্গে ঠানদির আলাপ পরিচয় খুবই গভীর। তা তো হবেই, তা হওয়াই তো স্বাভাবিক! রাত এগারটার পরে শচীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যেতেন দাছ, এতক্ষণে সেটা একেবারে পরিষ্কার বোঝা গেল! সুতরাং ঠানদিটিকে যে ভাবে হোক পাকড়াও করতেই হবে। আরও অনেক কিছু জানা যাবে হয়তো ঠানদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে। হঠাৎ অন্তর্ধান করেছেন শচীনন্দন, এই সংবাদটি কি জানিয়েছে ওরা তাঁকে। যদি না জানিয়ে থাকে, তাহলে জানাতে হবে। দেখতে হবে, কি ফলটা ফলে। ঠানদি হয়তো কিছু ঠাওরাতে পারেন।

শরীর ক্লান্ত, রাতও শেষ হোয়ে এসেছে তখন, ঘুমিয়ে পড়ল নতুন ঠানদির সম্বন্ধে নানা রকম ভাবতে ভাবতে। ভোরে ঘুম ভাঙল দরোয়ানদের ডাকাডাকির চোটে। কি ব্যাপার!

কাল যে জেনানাটি এসেছিলেন তিনি আবার এসেছেন। গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। বলছেন, হুজুরের সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই ফিরবেন না। দরওয়ানরা জানিয়েছিল যে হুজুর ঘুমুচ্ছেন, বেলায় উঠবেন। জেনানাটি কিছুই শুনতে চান না। জিদ ধরেছেন এখনই দেখা করার জন্যে। ভয়ানক জরুরী দরকার, এখনই শুনতে হবে তিনি কি বলতে চান। না শুনলে নাকি হুজুরদেরই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে!

যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ছুটল গেটে। না চাইতেই জল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন একেই বলে। ঠানদিকে খুঁজে বার করার দিকদারিটা আর ভুগতে হোল না।

কিন্তু একি!

থতমত খেয়ে পড়ল। নতুন ঠানদি তখনও দশ হাত সামনে।

ও আবার কে রে বাপু!

দরওয়ানদের দিকে তাকাল। উভয়েই তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে জানালে—“আজ্ঞে হাঁ, উনিই কাল এসেছিলেন।”

তার সমবয়সী একটি মহিলা ব্রস্ত পদে এগিয়ে এলেন। ছ’হাত জোর করে বললেন—“নমস্কার, আমি মিষ্টার সেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি—”

“বরুণ সেন। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।” জবাব দিয়ে পিছন ফিরল।

নিয়ে গেল নিজের ঘরে, কারণ ঐ ঘরখানাই খোলা আছে।

“কোথায় বসবেন? এ ঘরে চেয়ার ফেয়ার কিছু নেই। আচ্ছা, বসুন ঐ বিছানায়—” বলে নিজে বসল টুলের ওপর। টুলখানা রয়েছে, তার ওপর রয়েছে টেপেরকর্ডারটা, সেটাকে নামিয়ে মেঝেয় রাখল।

বসবার আগেই মহিলাটি বলে উঠলেন—“ভয়ানক বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম।”

“তা তো বুঝতেই পারছি।” যথাসম্ভব নির্লিপ্ত ভাবে সায় দিল।



“যদি আমাকে বলেন কোথায় গেলেন শচীবাবু—”

“অসম্ভব।”

“অসম্—!” প্রায় আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

“অনিবার্য অসম্ভব, কারণ শচীবাবু বলে যান নি আমাকে যে কোথায় গেলেন।”

“কোথায় গেছেন আপনি জানেন না!”

জবাব না দিয়ে বরুণ মুখ টিপে রইল। আধ মিনিটটাক্ মহিলাটি ওর মুখ পানে তাকিয়ে থেকে মাথা হেঁট করে বেশ লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর ভয়ানক রকম কিছু ভাবতে ভাবতে বিছানার ধারে গিয়ে বসে পড়লেন। নজর তখনও মেঝের ওপর, কি যেন ঠাওরাবার চেষ্টা করছেন! বরুণ দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে নিজের গালে ঠাসঠাস করে চড়াতে ইচ্ছে হোল। হায় হায় রে, তুলসী ঠানদি সম্বন্ধে কি রকম অসম্ভব ধারণাই সে মনের মধ্যে—

হঠাৎ মহিলাটি মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—“আমাকে দেখে কি ধারণা হোল আপনার?”

আর একটু হোলেই চমকে উঠেছিল বরুণ। সামলে গিয়ে বলল—  
“ধারণা! মানে—ধারণা যা হোয়েছিল সব উলটে গেল। আমি ভেবেছিলাম—” বলতে বলতে থেমে পড়ল। একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল—“আগে বলুন আপনার নাম কি? আপনার নাম তুলসী—কেমন কি না?”

মহিলাটি শুধু ঘাড় নাড়লেন।

“তা’হলে সত্যি কথাই বলব”—সোজা হোয়ে বসে শুরু করলে বরুণ—“সত্যি কথা হচ্ছে, কাল অনেক রাতে ফিরে এসে যখন শুনলাম আপনার কথা তখন থেকে যা ধারণা করেছি মনে মনে সমস্ত উলটে গেল। আমি ধারণা করেছিলাম, আপনার বয়েস অন্ততঃ পঞ্চাশ হবেই। বেশ গিন্নীবান্নী গোছের মানুষ, মটকা বা গরদ পরে আছেন। তীর্থ ধর্ম করে বেড়ান। দাছ যে আপনার মৃত নেহাত ছেলেমানুষকে—”

“তিনিই আমার ঐ নাম রেখেছেন। শুধু তিনি আমাকে তুলসী বলে ডাকতেন।” বলতে বলতে তুলসীর গলা ধরে এল।

বরুণ বললে—“না না, এ কথা বলছি না আমি যে তুলসী খুব খারাপ নাম। নামটি বেশ, বেশ একটি পবিত্র পবিত্র ভাব জেগে ওঠে ঐ নাম শুনলে। ঐ নামটি দিয়ে খারাপ কিছু করেন নি দাছ। তবে ঐ নাম ঠিক মানায় না আপনাকে।”

“বাদ দিন নাম” তুলসী সোজাশুজি কাজের কথা পাড়ল—“আমাকে দেখে পাজী মানে ইতর বজ্জাত বলে ধারণা হচ্ছে কি আপনার? আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবেন কি না। আপনি আমাকে চেনেন না। আমার পরিচয় জানেন না। এই রকম অবস্থায়—” থেমে গেল তুলসী। কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে গেছে সে তা’ বলে বোঝাতে পারবে না, বললেই বা কে তাকে বিশ্বাস করবে।

বরুণ বুঝল। বুঝে সাবধান হোল। বলল—“তাহলে থাকুক, জানাবেন না কিছু আমাকে। যা জানাবেন তা বিশ্বাস করবই, এমন কথা আপনাকে দিতে পারছি না।”

বেশ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল তুলসী। তারপর বেশ চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—“তা’হলে শচীবাবুকে বাঁচানো গেল না। এখনো চেষ্টা করলে হয়তো—”

“করুন না চেষ্টা, চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।” নির্জলা নিরুৎসুক কণ্ঠে কথার পিঠে কথা বলা গোছের বললে বরুণ।

“কি করে করব চেষ্টা? একলা মেয়েমানুষ আমি, কি চেষ্টা করব?” হাহাকার করে উঠল তুলসী। আবার বসে পড়ল বিছানায়, বসে বিজবিজ করে নিজেকে নিজে শোনাতে লাগল—“তিনি নেই, তিনি থাকলে শচীবাবুকে এভাবে মরতে হোত না। শচীবাবু নিমকহারামি করবেন না, তাই মরবেন। হায় হায় রে, আর যদি কয়েকটা দিন আগে আমি ফিরতে পারতাম!”

“হাঁ, আপনার জন্তে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ছিলেন শচীবাবু।”



“আমার জন্মে ! কি করে জানলেন যে আমার জন্মে অপেক্ষা করে ছিলেন ?”

জবাব না দিয়ে টেপেরেকর্ডারটি টুলের ওপর তুলে চালিয়ে দিল বরুণ সেন। খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকাকার ডাক শোনা গেল। তারপর স্পষ্ট ফুটে উঠল কয়েকটি কথা—“আর কত দিন ! উঃ আর কত দিন !”

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল তুলসী। প্রায় চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—“কে ! কে বললে ঐ কথাগুলো !”

ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চেপে ধরে মুখ বন্ধ করতে ইশারা করল বরুণ। ততক্ষণে আবার ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়েছে। একটু পরে খেঁক খেঁক চোঁচামেচি শোনা গেল খানিক, কোথায় যেন শিয়ালেরা কামড়াকামড়ি করছে। তারপর আবার কথা, বুক ভাঙা কয়েকটি কথা ফুটে উঠল—“আর পারি না, এ ভাবে বেঁচে থাকতে আর পারছি না যে আমি।”

সামান্য একটু আওয়াজ ফুটল তুলসীর গলায়, অব্যক্ত আর্তনাদ। ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখন সে যন্ত্রটার পানে ! যন্ত্র থেকে আর একবার কয়েকটি কথা জন্মগ্রহণ করল—“জীবন ভোর ঠকেছি, এবারও ঠকব নাকি !”

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তুলসী—“না না, কিছুতেই নয়। ঠকবে না তুমি, কিছুতেই ঠকবে না। এই তো আমি ফিরে এসেছি। আমি—আমি—আমি—”

“আপনি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসুন” খুবই ঠাণ্ডা গলায় হুকুম দিল বরুণ। টেপেরেকর্ডার বন্ধ করে বলল—“ঝিঁ চাকর দরোয়ানরা আজো ভাবতে পারে। উদ্বেজিত যদি হন, তা’হলে—”

তুলসী তখনও চোঁচাতে লাগল—“ওকি ! বন্ধ করছেন কেন ? আর কি বলেছেন তিনি—”

“পরে হবে।” এইবার বরুণ সেনের গলায় কড়া সুর শোনা

গেল—“চুপ করে বসে থাকুন। মুখে হাতে জল দিতে যাচ্ছি আমি। যতক্ষণ না ফিরে আসব বসে থাকবেন। চা আনতে বলছি। চা খেয়ে আপনার সঙ্গে বেরুব।”

কোথায় যাচ্ছি !

পথে পা দিয়ে ছুঁজনেই ভাবছে এক কথা—যাচ্ছি কোথায়। কথা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ, কথা বন্ধ করে নিজের নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে চা খেয়েছে ছুঁজনে, তারপর বেরিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি হাঁটছে, আর ভাবছে কোথায় চলেছি।

ঘড়িটায় দম দিতে হবে। হাত থেকে খুলে ঘড়িতে দম দিতে লাগল বরুণ। নিজের ঘড়ির পানে তাকিয়ে তুলসী জিজ্ঞাসা করল—  
“কত হোল আপনার ঘড়িতে?”

“সাঁইত্রিশ, ছ’ এক মিনিট গ্লো থাকতে পারে। চল্লিশ করে নিন, ছটা চল্লিশই হবে এখন।” বলতে বলতে বরুণ ঘড়িটাকে হাতে বেঁধে নিল।

“এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়?” জিজ্ঞাসা করল তুলসী।

“আপনার আস্তানায়।” তৎক্ষণাৎ জবাব দিল বরুণ।

“আমার আস্তানায়!” আকাশ থেকে পড়ল তুলসী, পা চালানো বন্ধ করে বলল—“কোথায় আমার আস্তানা! আমার তো কোনও আস্তানা নেই!”

“তা’হলে কি এই কথাই বলতে চান যে দিন রাত আপনি পথে পথে ঘুরছেন?”

“তা’ কেন ঘুরব, কিন্তু এখানে আমার আস্তানা কোথায়?”

“এখানে নেই তা’ আমিও জানি। যেখানে আছে সেখানেই যাওয়া যাক—চলুন।”

“কেন আপনি যেতে চাচ্ছেন আমার আস্তানায়?”

“যেতে তো হবে কোথাও। কোথাও বসে ঠাণ্ডা মাথায় পরামর্শ



করতে হবে। ও বাড়িতে আপনার সঙ্গে কথা বলারও উপায় নেই।”

“কেন!” খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল তুলসী।

বরুণ বলল—“কেন তা’ আপনিই আমার চেয়ে ভাল করে জানেন। মল্লিকার মা গোপীনাথ দরোয়ানরা আপনাকে চেনে না বলতে চান?”

“চিনবে না কেন! এতদিন ও বাড়িতে কাটালাম—”

“এতদিন ও বাড়িতে কাটালেন! তার মানে?”

“মানে—” জোর করে একটা ঢোক গিলে কথা বন্ধ করে ফেলল হঠাৎ তুলসী। বরুণ সেন দেখতে পেল, ওর দুই চোখে জল উপছে উঠছে।

কয়েক মুহূর্ত চোখ দু’টির পানে তাকিয়ে থেকে বলল—“শচীবাবুকে বাঁচাবার চেষ্টা যদি করতে হয় তা’হলে আপনাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। যত দেরী করবেন বলতে ততই জট পাকাবে ব্যাপারটার। বলতে যদি বাধা থাকে তা’হলে আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে। কারা ধরে নিয়ে গেছে শচীবাবুকে, কোথায় নিয়ে গেছে, তা’আপনি জানেন।

“তা’হলে—” তুলসী খুব বিচার বিবেচনা করে বলতে লাগল—“তা’হলে আপনাকে তৈরী হয়ে যেতে হবে। কোথায় কার কাছে যেতে হবে তা’ আমি বলে দোব। কিন্তু এভাবে যাওয়া চলবে না। এমন ভাবে তৈরী হয়ে যাবেন যাতে আপনার ক্ষতি না হয়। সাংঘাতিক কাণ্ড হোতে পারে—মানে—মানে—মানে—”

বরুণ আটকানো কথাটা যুগিয়ে দিলে—“মানে যার কাছে পাঠাবেন, সে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারে।”

“হাঁ—এমন কি আপনার মুখ বন্ধ করবার জন্তে—”

“আমাকে খতম করেও দিতে পারে।”

“অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয়, সে লোক সব করতে পারে।”

“কিন্তু হঠাৎ সে খুনখারাপি করতে যাবে কেন?”

“ঠিক সেই কারণে যে কারণে শচীবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলেছে।”

“ধরে নিনে গিয়ে—”এবার বরুণের কথা আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তুলসী বাকীটুকু যুগিয়ে দিলে—“এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে ছনিয়ার একটি প্রাণীও শচীবাবুকে খুঁজে পাবে না।”

বাগরোধ হয়ে গেল বরুণের। ব্যাপারটা ঠিক এতখানি স্পষ্ট ভাবে ভেবে উঠতে পারেনি। আবছা আবছা গোছের একটা সন্দেহ বা ভয় অনেকবার উদয় হয়েছে তার মনে, আমল দেয়নি। ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম করে ফেলা, এ সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা ছাপা বইতে পড়া যায়, পড়ে বেশ একটু বিচিত্র জাতের অনুভূতি জাগে মনে, কিন্তু সত্যি সত্যি একটা লোককে তার বাড়ি থেকে তার চোখের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে হয়তো এতক্ষণে—

ছুই কান নাক মুখ আগুনের মত তেতে উঠল। কোমরবন্ধটাকে আরও খানিক কষে নিয়ে বললে—“তা’হলে চলুন আগে সহরে যাই। আগে থানায় জানাতে হবে, টেলিগ্রাম করতে হবে বাবাকে, কাকাদেরও জানাতে হবে ব্যাপারটা। তারপর থানার সাহায্য নিয়ে—”

“কি বলবেন ওদের?” ভয়ঙ্কর বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করল তুলসী।

স্পষ্ট দেখতে পেল বরুণ, ওর কপালের ওপর অনেকগুলো কোঁচ পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল যে বিবম ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু তখন আর পেছুবার উপায় নেই। অতএব সোজা পথ ধরল। বললে ডাকাতির ঘটনাটা, ডাকাতরা কি নিয়ে গেছে তাও বললে। ডাকাতি যখন হয়েছে বাড়িতে তখন থানায় জানানো দরকার। এমনতেই অনেক দেরি হয়েছে গেছে, কালই ডায়ারি করা উচিত ছিল।

সহের সীমা পার হয়ে গেল তুলসীর। অসম্ভব রকম বিরক্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে, গলার স্বরও ভয়ানক রকম তেতে উঠল। বললে—“বেশ বেশ, তা’হলে তাই যান। থানায় যান, টেলিগ্রাম করুনগে যান, আর যা যা দরকার সব করুনগে। এখন



বুঝি, আপনার কাছে আসাই ভুল হয়েছে। আন্দাজ করতে পারি  
নি, জ্ঞানপ্রকাশ সেনের নাতি এতখানি—”বাকীটুকু বললে না, মুখ  
সামলে নিলে।

বরুণ সেটুকু আওড়ালে—“এতখানি অপদার্থ হবে তা’ বুঝতে  
পারেন নি। কিন্তু এই অপদার্থটার সঙ্গে আপনাকেও যে যেতে হবে  
থানায়। কে বা কারা শচীবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে  
তা’ আপনি ওদের বলবেন।”

“আমি!” রাগে ফেটে পড়ল তুলসী—“আমি যাব থানায়!”

“ইচ্ছে করে না যান, অথু উপায় আছে।”

“কি সেই উপায়টা? ওদের কাছে আমার নাম করবেন আপনি—  
এই তো? কিন্তু ওরা আমার পাত্তা পাবে না।”

“তার চেয়ে সহজ উপায়ও রয়েছে।”

“কি সেই উপায়টা আমি শুনতে চাই।”

“এই যে দেখাচ্ছি।” কথাটা শেষ হবার আগেই থপ করে ওর  
একটা কবজি ধরে ফেলল বরুণ, সঙ্গে সঙ্গে আর এক হাত দিয়ে ওর  
কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। হাত ছেড়ে  
দিয়ে বলল—“এই ব্যাগটায় যা রয়েছে, তা’ আমি ব্যবহার করতে  
জানি। ছুটে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। দশ হাত এগোবার  
আগেই খোঁড়া হবেন।” বলতে বলতে ব্যাগ খুলে ছোট্ট রিভলবারটা  
বার করে ফেলল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারিফ করলে—  
“চমৎকার জিনিষ, আসল জার্মানি মাল, পেলেন কোথায়?” হাঁ  
করবার ফুরসুত পেল না তুলসী, তার আগেই খুট করে একটু  
আওয়াজ হোল। বরুণ বলল—“ঐ দেখুন, ওধারে চান” সঙ্গে সঙ্গে  
একটু জোরে আর একবার আওয়াজ হোল। বাঁ দিকে তাকিয়ে তুলসী  
দেখতে পেল, হাত দেড়েক লম্বা একটা গোসাপ ধড়ফড় করছে। তার  
লেজের ঝাপটায় মাটির ডেলাগুলো ছিটকে উঠছে। হোস হোস ফোস  
ফোস করে গজরাচ্ছে গোসাপটা আর উলটে পালটে আছাড় খাচ্ছে

কোনও রকমে মাত্র দুটি কথা বলতে পারল সে—“মরে গেল !  
সতি মরে গেল !”

অস্ত্রটিকে ব্যাগে পুরে ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরে বরুণ বলল—“নিন,  
কাঁধে বোলান শিগ্গির। এটা ব্যবহার করার জন্তে কাঁধে ঝুলিয়ে  
বেড়াচ্ছেন না তা’হলে, গয়নার মত ব্যবহার করছেন। বেশ বেশ,  
খুব খুশী হলাম আপনার নতুন জাতের গয়না দেখে। গয়নাটি যে কি  
রকম মারাত্মক জিনিষ তাও জানতেন না তা’হলে ? চমৎকার—  
চমৎকার !”

হাতই তুললে না তুলসী ব্যাগটাকে নেবার জন্তে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে  
সেটার পানে তাকিয়ে রইল। বরুণ বললে—“নিন আপনার গয়না,  
গলায় বোলান।”

অল্প একটু মাথা নাড়ল তুলসী, একটু পিছিয়ে গেল।

“কি আপদ ! আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে নাকি এটা !” বলে  
হেসে উঠল বরুণ। তারপর রিভল্‌বারটাকে আবার বার করলে ব্যাগ  
থেকে। ব্যাগের ভেতর হাত পুরে কি যেন খুঁজতে লাগল। শেষে  
রিভল্‌বারটা প্যাণ্টের পকেটে ফেলে ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরে বললে—  
“নিন এখন। পাজী জিনিষটা আমার কাছেই থাকুক। আর আমি  
রইলুম আপনার সঙ্গে আপনার বডিগার্ড হোয়ে। যিনি আপনাকে  
এই জিনিষটি দিয়েছেন তাঁর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। কি করে এটি  
ব্যবহার করতে হয় তাও বোধ হয় শিখিয়ে দেননি ? খামকা এটাকে  
বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন তা’হলে ?”

কোনও কথাই যেন কানে গেল না তুলসীর, অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা  
করলে—“কি করে জানলেন যে ওটা রয়েছে ব্যাগের ভেতর ?”

“গুণতে জানি একটু একটু কিনা।”

“গুণতে জানেন ! তা’হলে গুণে দেখছেন না কেন কোথায় গেছেন  
শচীবাবু ?”



“সেটা পারতাম যদি তিনি ব্যাগের ভেতর বন্ধ হয়ে কারো কাঁধে ঝুলতেন।”

“সত্যি বলুন না, কি করে টের পেলেন যে আমার ব্যাগের ভেতর ওটা রয়েছে?”

“ভয়ানক অন্তমনস্ক মানুষ তো আপনি! কাঁধ থেকে ওটাকে বিছানায় নামিয়ে রেখে চা খেলেন। তারপর ব্যাগটা না নিয়েই চলে আসছিলেন। আমি তখন ব্যাগটা তুলে আপনার হাতে দিলাম—মনে পড়ছে?”

“কিন্তু খুললেন কখন? খুলতে তো দেখিনি।”

“আপনি খুললেন। খুলেই ভেতরে উঁকি দিয়ে মালটি যথাস্থানে আছে দেখে কাঁধে ঝোলালেন।”

“সেই ফাঁকে আপনিও দেখে ফেললেন বুঝি?”

“কি করে সেটা সম্ভব। আমি তো তখন অনেকটা তফাতে গিয়ে—”

“তা’হলে? বলুন না কি করে জানতে পারলেন?” এবার অকপট মিনতি ফুটে উঠল তুলসীর স্বরে।

বরুণ বললে—“ঐ জিনিষটার ওজন—ব্যাগটা হাতে তুলেই টের পেলাম বেশ ভারি একটা কিছু আছে ভেতরে। তখন টিপে দেখলাম। সে কথা যাক, এইবার আমি যা জানতে চাচ্ছি তার জবাব দিন। কোথায় পেলেন অস্ত্রটা?”

“চুরি করেছি।”

“চুরি করেছেন!” একটু থেমে থেকে মাথা নেড়ে বলল—“বিশ্বাস করতে পারলাম না। খামকা কেউ কিছু চুরি করে না। এই জিনিষটা ব্যবহার করতে জানেন না আপনি, খুব সম্ভব কখনও কেউ এটাকে আপনার সামনে ব্যবহারও করেনি। এই প্রথম দেখলেন যে এটা দিয়ে খুন করা যায়। শুধু শুধু এটা চুরি করলেন কেন? ও ভাবে এটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোও দস্তুরমত বুঁকির কাজ।”

“ঝুঁকির কাজ!” খুবই করুণ একটু হেসে তুলসী বলল—“আমার কাছে কোনও কাজই ঝুঁকির কাজ নয় বরুণবাবু। কোথায় ছিলাম এতদিন, কারা আমায় আটকে রেখেছিল, কি অবস্থায় ছিলাম, এই সব জানলে ঐ ঝুঁকি কথাটা আর বলতে পারতেন না। কেন ওটাকে চুরি করে এনেছি জানেন, ওটা আপনার দাছকে দিতে এনেছি।”

“দাছকে দিতে—”

“হাঁ, তাঁকেই দিতাম যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হোত! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা হোল না।” বলতে বলতে তুলসী একপাশে সরে গিয়ে ধুলো মাটির ওপর বসে পড়ল। বেচারীর তখন খাড়া থাকবার শক্তিটুকুও নেই।

নিখর হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল বরুণ সেন। আর একবার মনে মনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে নিতে গেল সে, গোছাতে গিয়ে আরও জট পাকিয়ে ফেললে! ঐ বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়েছে তুলসী, এ কথাটা নিজেই স্বীকার করেছে। অনেক দিন মানে কত দিন! কি করত ও!

গোপীনাথ ওকে দেখতে পারে না, গোপীনাথ একটা যাচ্ছেতাই ইঙ্গিত করলে, দরওয়ানেরা মোটে চিনতেই পারে নি। মল্লিকার মায়ের সঙ্গে কথা বলে আধ ঘণ্টা পরে চলে গেছে তুলসী। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে বা হোয়ে গেছে। তা’ হলে রাতটা ও কাটাল কোথায়। কোথা থেকেই বা এল ভোর বেলায়!

শচীনন্দন উধাও হোয়েছে, কোথায় গেছে কাউকে জানিয়ে যায় নি। মল্লিকার মা কিন্তু এ কথাটা শোনায় নি। শুধু জানিয়ে দিয়েছে যে শচীবাবু নেই। সেই জন্মেই ভোর বেলা ছুটে এসেছে কোথায় গেছে শচী তাই জানতে। সবচেয়ে বড় কথা, তুলসী জানে যে শচীকে ধরে নিয়ে গেছে, ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখা হোয়েছে শচীকে, হয়তো তার প্রাণটাও যেতে পারে, এই হোল তুলসীর ধারণা।

বেশ কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে রইল সে তুলসীর দিকে!



তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। নিচু হয়ে ওর  
একখানা হাত ধরে বললে—“উঠুন, ফেরা যাক।”

চমকে উঠে তুলসী বলল—“কোথায়?”

“আপনার দাছর বাড়িতে।” বলে এক রকম জোর করেই টেনে  
তুলল ওকে। তারপর হাত ধরেই নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। গেটের  
কাছাকাছি গিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—“মনে রাখবেন, এবার আমি  
আপনাকে ধরে এনেছি।”

তুলসীর আত্মকাহিনীটিকে সহজ ভাবে শোনাবার জন্যে ঠিকঠাক ছকে ফেলে এ পর্যন্ত এগিয়ে আনলাম আমি। আশা করছি যে যেটুকু বলা হোল সেটুকু বুঝতে আপনাদের কষ্ট হয়নি। তালগোল পাকানো ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব জট ছাড়িয়ে গল্পের মত করে বলবার চেষ্টা করেছি। পেশাদার গল্প লিখি়ের পক্ষে ওটুকু করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এর পর থেকে কিন্তু আমাকে যথেষ্ট সাবধান হোতে হবে। কারণ এখন শুরু হবে এমন কতকগুলো ব্যাপার যার সঙ্গে পরলোক জড়িয়ে আছে। পরলোক কি, পরলোকটা কোথায়, পরলোকটা কি রকম, এই সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোনও কালে হয়নি আমার। মোটামুটি একটা ধারণা আছে যে মরবার পর যেখানে যাব সেইটে পরলোক। অজ মূর্খ বললে যা বোঝায় তা ঠিক নই, ছিটে ফোঁটা বুদ্ধি যা আছে ঘটে, তাতে এইটুকু মানতে বাধ্য হয়েছি যে এই দেহটা ঠিক আমি নই। মরতে দেখেছি অনেককে, দেহটা পড়ে আছে লম্বা হোয়ে, শ্রেফ শ্বাস প্রশ্বাসটুকু বইছে না। অগত্যা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি যে আসলে আমি ঐ শ্বাস প্রশ্বাস বা যে শক্তিটুকু এই দেহের ভেতর আছে বলে শ্বাস প্রশ্বাস বইছে সেই শক্তিটা। রসিক মানুষে বলে প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হোয়ে গেল। তার অর্থ দেহটা হোল খাঁচা, খাঁচার ভেতর বদ্ধ হোয়ে আছে প্রাণপাখী, সেই পাখীটাই হচ্ছি আসল আমি। এই পর্যন্ত মানতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তারপর!



তারপর সেই প্রাণপাখীটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে কোথায় যায় কি করে তা জানার উপায় কি !

উপায় হয়তো আছে। কিন্তু প্রাণপাখী নিয়ে গবেষণা করার ফুরসত কোথায় আমাদের ! ধড়ে যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস বইছে ততক্ষণ আমাদের মরবার ফুরসতও হয় না। এই যে ইহলোক বলতে স্থানটি, যেখানে এতটুকু একটু খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে আবির্ভূত হয়েছিলাম, এই স্থানটির আলো বাতাস মাটি আকাশের এমনি গুণ যে ঐ কাল্পনিক হাসির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সদা সর্বক্ষণ ভূতের বেগার খেটে মরছি। ভূতটিকে চিনিও না জানিও না। চেনবার জানবার গরজও নেই। অতঃপর একদিন ভূতে ঘাড় মটকে রেখে যায়, প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হয়। হোয়ে যায় কোথায় তা তখন জানা যায় বটে, কিন্তু সে বারতা ইহলোকে ফিরে খাঁচায় বদ্ধ জীবদের জানানো যায় কি !

যায়।

ম্যারীন্ এন্জিনিয়ার বরুণ সেনকে তার পিতামহ জ্ঞানপ্রকাশ সেন পরলোক থেকে এসে জানিয়ে দিলেন পরলোকটা কেমন স্থান। শুধু ঐটুকুই জানালেন না, যে ইহলোক তিনি ছেড়ে গেছেন সেই ইহলোক সম্বন্ধেও এমন কতকগুলো ব্যাপার জানালেন যা জানা ইহলোকের কারো পক্ষে একেবারে অসম্ভব। জানালেন কিন্তু তুলসীর মুখ দিয়ে। তাই বরুণ সেনের ধোঁকা লেগে গেল, ব্যাপারটা ঠিক অবিশ্বাস না করলেও ষোল আনা গায়ে মাখল না।

যাক, পরলোকের কথা পরে হবে। এখন ইহলোকের কথা আরও কিছু বলা দরকার।

ফিরিয়ে নিয়ে এসে সোজা ওপরে তুলল তুলসীকে বরুণ সেন। নিজের ঘরে বসিয়ে গোপীনাথকে ডাকল। গোপীনাথ আসতেই সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল—“যে ঘরে ইনি থাকতেন সেই ঘর খুলে দাও। মল্লিকার

মাকে বল ঘরখানা পরিস্কার করার জন্তে। এঁরও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে।”

বেচারি গড়গড়ি ! মুখ হেঁট করে বলল—“সে ঘরে তালা দেওয়া।”

“তালা ভাঙতে হবে।” গলার স্বর চড়ল বরুণের।

গোপীনাথ তোতলাতে শুরু করলে—“চা চা চাবি ওঁর কা কা কাছে—”

“হাঁ, আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম চাবি, কিন্তু কিছুই ফেরত আনতে পারিনি।” বলে তুলসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বরুণ বলল—“ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি, তালা ভাঙতে এক মিনিট লাগবে না। চল গোপীনাথ।”

তুলসী উঠে দাঁড়াল। কি যেন বলতে গেল সে, সুযোগ পেল না। ওরা দু’জনে তখন ঘরের বাইরে পা দিয়েছে। তুলসীও ছুটল ওদের পেছন পেছন, ঘর খোলবার সময় তাকে সেখানে থাকতেই হবে।

দোতলা থেকে একতলায় নেমে গোপীনাথ সিঁড়ির নিচে একটা দরজা দেখিয়ে বলল—“ঐ দরজা, পেছন দিকেও একটা দরজা আছে, বাইরের রোয়াকে যাওয়া যায়।”

দরজাটা খুব ছোট, দরজার মাথা বরুণের কোমর ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছল না। আশ্চর্য হোয়ে গেল বরুণ, ঐটুকু দরজা দিয়ে ঢুকত বেরত ! হামাগুড়ি দিত নাকি !

ছোট দরজা হোলেও তালাটি প্রমাণ সাইজের, দরজার মাথায় শিকল আটকে তালা লাগানো হোয়েছে। ঐ দরজাটা বাড়ি শুদ্ধ সকলেরই নজরে পড়েছে। সবাই ভেবেছে, সিঁড়ির নিচে বাজে জিনিষপত্র রাখবার ঘর, যেমন অল্প সব বাড়িতে থাকে। কি আছে ওখানে তা জানবার জন্তে কেউ ঐ দরজাটা খোলে নি। মানে, আন্দাজই করতে পারে নি কেউ যে দরজার পেছনে এমন একটা ঘর আছে যে ঘরে মানুষ বাস করতে পারে। বাড়িতে এতগুলো ঘর থাকতে এই ঘরখানায় কেন থাকতে দেওয়া হোয়েছিল তুলসীকে !



ঘরে ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি দিতে হবে, বেরুতে গেলেও শাস্তি দেবার ফন্দিটি কিন্তু চমৎকার।

পেছনে রোয়াকে বেরুবার জন্তে একটা দরজা আছে, এ ব্যবস্থাটিও চমৎকার। যখন খুশি চলে যাও, বাড়ির কেউ দেখতে পাবে না। যে কেউ সেই দরজা দিয়ে ঘরে আসতে পারে যেতে পারে, আসা যাওয়াটা বাড়ির লোকেরা জানতেই পারবে না। বেছে বেছে ভাল ঘরখানিই তুলসীকে দেওয়া হয়েছিল বটে।

দরজাটা কিন্তু খোলা দরকার। একখানা শাবল পেলেই হয়, শিকলের ভিতর ঢুকিয়ে চাড় দিলে শিকল উপড়ে আসবে। তালা ভাঙবার দরকার হবে না।

হুকুম করল গোপীনাথকে শাবল আনবার জন্তে, সন্ন গোছের একটা শাবল চাই, জানলার একটা গরাদ হোলেও চলবে। শিগ্গির দেখ, যা পাওয়া যায় নিয়ে এস।

গোপীনাথ চলে যাবার পর সিঁড়ি থেকে নেমে পাশে গিয়ে দাঁড়াল তুলসী। চাপা গলায় মিনতি করে বলল—“খুলবেন না এখন ঘরটা, আমার অনুরোধ এখন ঐ দরজা খুলবেন না।”

“কেন!” বরণ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকবার পর সহজ সুরে বলল—“ঠিক আছে। চলুন তাহলে ওপরে যাই। গোপীনাথকে বলে দিচ্ছি আর একটা ঘর খুলে দিতে। বিশ্রাম করবেন তো। যে রকম অবস্থা হয়েছে আপনার, খেয়ে দেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলে—”

“ঘুম!” বদ্ধ পাগলের মত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর মুখপানে। বিড় বিড় করে আর একবার উচ্চারণ করল—“ঘুম!”

আবার বরণকে ধরতে হোল ওর হাত। হাত ধরে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—“হাঁ, এবার আপনি ঘুমবেন। নিশ্চিত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন। আপনি ফিরে এসেছেন আপনার নিজের জায়গায়,

আপনার দাছর বাড়িতে। দাছ নেই, আমি আছি। আমি বরুণ সেন, আমার ওপর নির্ভর করে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বেন।”

সহজ কথা, সামান্য কথা। একটি বাক্য স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল বরুণ সেন। ফল হোল। চোখ বুজে এল তুলসীর, সম্মোহিত হোয়ে পড়ল যেন সে, একটু একটু টলতেও লাগল যেন। এবার ওর হাত ধরে ওপরে নিয়ে যেতে হোল বরুণকে। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিতেই তুলসী ঢলে পড়ল। বাস্তব খুলে একখানা চাদর বার করে বরুণ ওর গায়ে চাপা দিয়ে দিলে।

শাবল হাতে করে ওপরে এসে গোপীনাথ জানাল, গাঁ থেকে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছে। নিশ্চয়ই নাথনু আর কুঞ্জ এসেছে। আটটার পরেই ওদের আসবার কথা ছিল। শাবলখানা রেখে যেতে বলল গোপীনাথকে। ঘুম যেন না ভাঙানো হয় তুলসীর, সাবধান করে দিল। জলযোগ করাতে হবে নাথনু আর কুঞ্জকে, তাড়াতাড়ি খাবার বানাতে হবে, তাই গোপীনাথকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতে ভুলল না।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই চোখ মেলে উঠে বসল তুলসী। মিনিট খানেক চুপ করে বসে থাকবার পর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজায় কান চেপে কি শোনবার চেষ্টা করল। তারপর একখানা কপাট খানিকটা ফাঁক করে বাইরে পা দিলে।

নাথনু আর কুঞ্জ এনেছে সাংঘাতিক সংবাদ। আগের রাত্রে যখন ওরা সেই লামামঠের সামনের পাহাড়ে বসেছিল, তখন বলদেও মিশিরের পাহাড়ী কুলিরা মঠ আক্রমণ করার জন্তে তৈরী হচ্ছিল। শেষ রাতের দিকে তারা মঠের ওপর চড়াও করে। বিস্তর লোক খুন জখম হয়েছে। আগুন লেগেছিল মঠে, অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। স্বয়ং বলদেও জখম হয়েছে, বাঁচে কি মরে এমন অবস্থা। মিশিররা রটাচ্ছে যে একখানা লরি উলটে গিয়েছিল, সেই লরিতে বলদেও



ছিল। দু'পক্ষই এখন বাপারটাকে চাপা দিতে চায়। খুন জখম  
হোয়েছে লড়াই করে, এই সংবাদ পেয়ে সরকারী হুজুররা যদি তদন্ত  
করতে যান মঠে তা'হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

“হঠাৎ কেন লাগল লড়াইটা?” জিজ্ঞাসা করলে বরুণ।

নাথনু বলল—“তাই আমরা জানতে যাচ্ছি। বলদেও মিশিরের  
যে সব কুলী মারামারি করেছে তাদের অনেকের সঙ্গে আমাদের  
পরিচয় আছে। চেষ্টা করলে হয়তো আসল ব্যাপারটা জানতে পারব।”

মারামারি হোয়েছে শেষ রাতে, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা  
পৌঁছল এদের কাছে।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বরুণ—“সত্যি সত্যি মরেছে  
নাকি মানুষ? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। যাচ্ছ যাও, গিয়ে  
হয়তো শুনবে কিছুই হয়নি। বাজে গুজব রটিয়েছে হয়তো কেউ।  
খবরটা তোমরা পেলে কোথা থেকে?”

কুঞ্জ বলল—“বাজে গুজব হোতেই পারে না। আমাদের গাঁয়ের  
তু'জন মানুষ রাত্রে সহরে ছিল, ভোর বেলা তারা ফিরে এসেছে।  
দেখে এসেছে, সহর সুন্দর মানুষ মিশিরের বাড়িতে জমা হয়েছে।  
পয়সাওয়ালা মানুষ কিনা, পয়সা থাকলেই লোকের ইজ্জত বাড়ে।  
সবাই জানে মিশির কি রকম শয়তান, তবু তার কাছে সবাই ছুটবেই।”

“আহা, আমি কি বলছি যে বলদেও মিশির জখম হয়নি।”  
বরুণ তর্ক জুড়ে দিল—“জখম নিশ্চয়ই হোয়েছে মিশির। কিন্তু  
মারামারি করে জখম হোয়েছে এটাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।  
লরি উলটে জখম হয়নি, এই কথাটা বলছে কারা? লামাদের মঠে  
চড়াও করেছিল মিশিরের লোকজন, অর্ধেকটা মঠ পুড়ে গেছে, এই  
খবরগুলো তোমরা পেলে কোথা থেকে?”

কুঞ্জ আর নাথনু নিজেদের ভেতর কি যেন পরামর্শ করে নিলে  
চোখে চোখে তাকিয়ে নিয়ে। নাথনু বলল—“রাগ যদি না কর, তা'হলে  
সত্যি কথাটা বলি। কুঞ্জর কাকা কালকেই জানতে পেরেছিল যে

মিশিরের লোকজন নেড়ামাথাওয়ালাদের ঠেঙাবার জন্তে তৈরী হোয়ে আছে। ওরাও খবরটা জানত। তাই সারারাত জেগে ছিল আর ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। যে পাহাড়ী গাঁয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, সেখানকার একজন মানুষ খুব ভোরে চলে এসেছে। লড়াইটা সে দেখে এসেছে। গাঁয়ের লোকরা ভয় পাচ্ছে, এবার হয়তো ওদের গাঁ লুঠ হবে। আমরা সেই গাঁয়ের মেয়েদের আর বাচ্চাদের নিয়ে আসবার জন্তে লোক পাঠিয়েছি।”

বরুণ বলল—“সেই পাহাড়ী গাঁয়ের মানুষরাও জানে না কেন লড়াইটা হোল! কিছু না কিছু নিশ্চয়ই তারা শুনেছে। খামকা তো আর লড়াই লাগতে পারে না?”

“তা শুনেছে।” এবার কুঞ্জ দরকারি কথাটি বলল। “লড়াইটা লেগেছে নাকি একটা মানুষ নিয়ে। মানুষটা লুকিয়ে আছে নেড়ামাথাওয়ালাদের মঠে, বলদেও সেই মানুষটাকে চায়। তাকে ছিনিয়ে আনবার জন্তে বলদেও লোকজন নিয়ে মঠ আক্রমণ করেছিল।”

দম বন্ধ হোয়ে এল বরুণের, কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করল—  
“ছিনিয়ে এনেছে নাকি তাকে?”

“ওরা সঠিক কিছু বলতে পারল না।”

নাথনু তাড়া লাগাল, এখনই ওদের যেতে হবে সেই মঠে। সেখানে গেলেই খোঁজ খবর সব পাওয়া যাবে। সত্যিই একটা মানুষের জন্তে অতবড় লড়াইটা হোয়েছে কিনা জানতে হবে। যদি হোয়ে থাকে, তা’হলে জানতে হবে সেই দামী মানুষটি কে? কি উদ্দেশ্যে বলদেও মিশির তাকে কেড়ে আনতে গিয়েছিল?

কুঞ্জ বলল—“আমরা এখনই রওনা হচ্ছি। ফিরে এসে সমস্ত তোমায় জানাব।”

অনেকটা সামলেছে তখন বরুণ। বলল—“কিছু খেয়ে যাও তোমরা। তোমাদের জন্তে খাবার বানাতে বলেছি।”

নাথনু বলল—“এখন থাক, আমরা খেয়ে বেরিয়েছি। সোজা



ফিরে আসব তোমার এখানে, এসে খাবারগুলো খেয়ে নোব।”

ওরা রওয়ানা হোল।

কে সেই মানুষটি!

লামারা যাকে লুকিয়ে রেখেছে মঠে সেই লোকটি কে!

নিশ্চয়ই শচী। শচীর সঙ্গে লামাদের পরিচয় আছে, দাছুর শেষ সময় শচীই লামাদের নিয়ে এসেছিল। শচীই গেছে লামাদের মঠে, বলদেও মিশির শচীকেই কেড়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন!

আর এগোবার উপায় নেই। কেন শচী গেছে লামাদের মঠে, কেনই বা তাকে হাতে পাবার জন্তে বলদেও হন্তে হোয়ে উঠেছে, আন্দাজ করাও অসাধ্য। বিশ্বাস করে বসল বরুণ সেন যে শচীই গেছে মঠে, শচীর জন্তেই লড়াই খুন জখম হোয়েছে। বিশ্বাসটা পেয়ে বসল যেন তাকে। ফিরে চলল তুলসীর কাছে, ব্যাপারটা ওকে জানাতে হবে।

হঠাৎ আর একটা কথা উদয় হোল মগজে। তুলসীও নিশ্চয়ই চেনে লামাদের। নিশ্চয়ই জানে তুলসী, লামাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল দাছুর। লামাদের মঠে গেছে শচী, এই সংবাদটি জানলে কি অবস্থা দাঁড়ায় ওর মুখ চোখের, ভাল করে লক্ষ্য করা চাই। লামা সংক্রান্ত জটটা খুলতে পারলেই অনেক ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঘুম ভাঙতে হবে। কিন্তু উপায় নেই, এখন ঘুমিয়ে থাকার সময় কই। অবিলম্বে যা করার করতে পারলে শচীকে হয়তো উদ্ধার করা সম্ভব।

তাড়াতাড়ি উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকল। ঢুকেই চমকে উঠল।

গেল কোথায়!

শুরু হোয়ে গেল ছোট্টাছুটি। গোপীনাথকে ডাকল, মল্লিকার মাকে ডাকল। তারপর তিনজনে সারা বাড়ি খুঁজে দেখল। বাড়ির ভেতর কোথাও নেই তুলসী, তা’হলে নিশ্চয়ই বসে আছে বাগানে গিয়ে। বাগানও খোঁজা হোল। দরওয়ানদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে কেউ গেটের বাইরে যায়নি। কি মুশকিল! আস্ত মানুষটা সশরীরে

অন্তর্ধান করল নাকি ! এ যে ভূতুড়ে কাণ্ড হোল দেখছি বাড়িতে !

বাগানবাড়ি একতলা সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল টপকে পালিয়েছে ! মেয়েমানুষ পাঁচিল টপকাবে।

দরওয়ানদের হুকুম করল, আগাগোড়া পাঁচিলটা দেখে আসবার জন্মে। কোনও গাছের ওপর চড়ে পাঁচিলের মাথায় যাওয়া যায় কি না দেখে আসতে হবে। পাঁচিলে কোথাও ভাঙাচোরা আছে কি না তাও লক্ষ্য করা চাই।

গোপীনাথকে আর মল্লিকার মাকে বাড়ির ভেতরটা আর একবার খুঁজে দেখবার জন্মে বলে গুম মেরে বসে রইল নিজের ঘরে। না, এ আর বরদাস্ত করা যায় না। সবাই তাকে বোকা বানাচ্ছে। আর একবার যদি দেখা হয় মহিলাটির সঙ্গে তা'হলে এমন শিক্ষাই দেবে—

শিক্ষা দেবার কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। ঘরটা তো এখনও খুলে দেখা হয়নি ! উনি অনুরোধ করলেন ঘরটা না খোলার জন্মে, আর অমনি সে মেনে নিল অনুরোধটা। নিকুচি করেছে তোর অনুরোধের, এখনই খুলতে হবে ঘরটা। দেখতে হচ্ছে ঐ ঘরের ভেতর কোন রহস্য ঘাপটি মেরে আছে। কোথায় গেল শাবলটা !

ঐ তো রয়েছে। তৎক্ষণাৎ শাবলখানা তুলে নিয়ে নিচে নেমে গেল। শিকল উপড়ে ঘরে ঢুকবে আগে, তবে অন্য কথা।

অভিজ্ঞ লোকে বলেন, মানুষ জীবনে একটি বারই চমকায়। দেহ-রূপ খাঁচা থেকে যে মুহূর্তে প্রাণপক্ষীটি বেরিয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে খাঁচী চমকানি যাকে বলে তাই আশ্বাদ করে মানুষে। হঠাৎ দেখে, তার দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কি হোল। হোল কি আমার। দিশেহারা হয়ে আঁকুপাঁকু করতে থাকে।

অনেকটা সময় লাগে কি হোল বুঝতে। বুঝতে পারে যে খাঁচা ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। তখন চেষ্টা করে আর একটিবার খাঁচাটির ভেতর ঢোকবার জন্মে। উপায় নেই, ব্যাপারটা পাকাপাকি বুঝতে



পারবার পরে তার আসল মৃত্যুটি ঘটে।

ঐ জাতের মোক্ষম চমকানির স্বাদ পেল বরুণ সেন দরজার সামনে পৌঁছে। গৌ ভরে নেমে গিয়ে প্রায় বুক সমান উঁচু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শাবল তুলল। তুলেই একদম থ।

তালাটি নেই, শিকলটি দরজার গায়ে ঝুলছে।

ব্যাপারটা মগজের ভেতর সঁজুতে বেশ কিছুটা সময় চলে গেল। তারপর কপাটের ওপর চাপ দিয়ে দেখল, ভেতর থেকে বন্ধ। শচীর ঘরের কপাটে আটা লাগানো হয়েছিল, সেই রকমের কিছু করা হয়েছে কি না ভাবতে লাগল। দরোয়ানদের ডেকে দরজা খোলবার কথা মনে হোল একবার, মতলবটি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করল। না, আর একবার চাকর দরোয়ানদের কাছে সে বেকুব বনতে পারবে না। দরজাটার পানে তাকিয়ে রাগে ফুলতে লাগল। খুব ইচ্ছে করতে লাগল গোটা কতক লাথি লাগাতে দরজার ওপর। সেই ইচ্ছেটিকেও চেপে গেল। তারপর দরজার গায়ে কান চেপে কি যেন শোনবার চেষ্টা করতে লাগল।

শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কিছু শোনা যাচ্ছে!

শ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বুঝতে পারলে— কথা বলছে, নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে কথা বলছে তুলসী, নিশ্চয়ই আর একজন কেউ আছে ঘরে, ফিসফিস করে কথা কইছে সেই আর একজনের সঙ্গে। কে সে!

মনে পড়ে গেল, আর একটা দরজা আছে, সেই দরজা খুলে বাইরের রোয়াকে যাওয়া যায়। আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল, এ দরজাটা না খোলবার জন্তে কি ভাবে অনুরোধ করেছিল তাকে তুলসী। ঐ ছ'টো ব্যাপার পর পর মনে পড়ে যাওয়ার ফলে দাঁউ দাঁউ করে আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। কি ভয়ানক শয়তানী বুদ্ধি! ঘরের ভেতর যে আছে, পাছে সে ধরা পড়ে, তাই অমন ভাবে দরজা খুলতে বারণ করা হোল। অনুরোধ শুনেই সে ভুলে গেল। না, আর এক

মুহূর্ত দেরি করা নয়, এখনই দরজা ভেঙে ব্যাপারটা কি দেখতে হবে।

কিন্তু এই দরজায় ঘা দিলে পেছনের দরজা খুলে যদি সরে পড়ে ছ'জনে! কিংবা শুধু সেই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ধরা দিল— তা'হলে কি হবে।

তৎক্ষণাৎ মতলব ঠিক করে ফেললে। তিন লাফে ওপরে উঠে নিজের ঘর থেকে একটা তালা এনে নিঃশব্দে সেই দরজাটায় আটকালে। তারপর গোপীনাথকে ডাকবার জন্তে রান্নাঘরের দিকে গেল।

গোপীনাথ নিশ্চয়ই জানে কোন দরজাটা খুলে ঐ ঘর থেকে রোয়াকে যাওয়া যায়। বাড়ির চতুর্দিক ঘেরা রোয়াক, রোয়াকের ওপরে পাশাপাশি এক মাপের জানলা দরজা এতগুলো রয়েছে যে গুণতে শুরু করলে দিন শেষ হয়ে যাবে। আর এক বিপদ হচ্ছে, কোনটে জানলা কোনটে দরজা বোঝা যায় না। খড়খড়ি লাগানো পাল্লা সবকটি জানলা দরজায়, পাল্লাগুলো সব বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ বাইরে থেকে সব এক রকম দেখতে, পাল্লা না খুললে কার সাধ্য বলে কোনটে জানলা কোনটেই বা দরজা। গোপীনাথ হয়তো পারবে, নিশ্চয়ই তার জানা আছে কোন পাল্লা খুললে ঐ ঘরে যাওয়া আসা যায়।

দূর থেকে গোপীনাথের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। খুব রেগে গেছে গড়গড়ি ঠাকুর, গড় গড় করে অনর্গল বকে যাচ্ছে। অত কি বলছে বুড়ো। কাকেই বা বলছে!

আরও এগিয়ে যাবার পর শোনা গেল—“রাজরাণী আবার এলেন, বুড়োর মাথাটি চিবিয়েছিলেন, এবার ঐ নাতির মাথাটিও খাবেন। ডাইনী, যার নাম গেছো ডান, চোখে চোখ পড়লে আর রক্ষে নেই। ভোর বেলা এল, ছোঁড়ার সঙ্গে চোখোচোখি হোল, আর অমনি—”

মল্লিকার মা কি যেন বললে, ফলে আরও চটে গেল গোপীনাথ। গলা চড়িয়ে চৈতাতে লাগল—“আলবৎ বলব, যা মুখে আসে বলব। কেন, আমার মাথা কেটে নেবে নাকি? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখনই



চলে যাব বিন্দাবন, বিন্দাবনে মহাপেসাদ মেলে, বিন্দাবনে কাউকে ভাত ভাত করে মরতে হয় না। পারব না আমি ঐ ডাইনীর ভাত রাখতে। ওরে আমার নবাব কত্রে রে! এ বাড়িতে তুইও যা ঐ রাজ-কত্রেও তাই। তুইও মাইনে নিয়ে ঝিগিরী করতে এসেছিস, উনিও তাই এসেছিলেন। তুই যা মাইনে পাস, ঐ ডাইনী কত্তাবাবুর কাছ থেকে তার বিশগুণ আদায় করত! কেন? কি কাজ করত ও? দিন রাত ঐ ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকত, আর গিলত। সেই বুড়ো সল্লেসীটা যে দিন আসত সেদিন তার সামনে ঢঙ করে চোখ উলটে ভিরমি যেত। সব আমি জানি, আমার নাম গোপীনাথ গড়গড়ি, আমার চোখে ধূলো দেবে? মুখ যদি ছোটাই—”

ছোটালে কি হবে সেটা বলবার সুযোগই পেল না গোপীনাথ, বরুণ একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—“থাক, মুখ ছুটিয়ে আর কাজ নেই। ময়দা আর মাখতে হবে না, হাত ধুয়ে আমার সঙ্গে এস। অণ্ড কাজ আছে!”

চক্ষের নিমেষে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে পড়ল গড়গড়ি। গদগদ কণ্ঠে বলল—“এই যে যাই ছোটবাবু, এক মিনিটের ভেতর হাত ধুয়ে আসছি।”

“সিঁড়ির নিচের ঘর থেকে বাইরের রোয়াকে বেরুবার দরজাটা আমায় দেখাতে পার গোপীনাথ কাকা?” নিতান্ত ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করল বরুণ।

গড়গড়ি গলে কাদা হয়ে গেল একেবারে। বলল—“পারব না! কি যে বলেন ছোটবাবু, আমি বলতে পারব না! এ বাড়িতে কটা জানলা কটা দরজা আছে সব আমার মুখস্থ। চলুন না, এগিয়ে চলুন। দালানের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে দরজাটা রয়েছে, সেইটে খুলে ওধারের রোয়াকে চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।”

অতএব চলতে লাগল। কয়েক পা এগিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল

—“বাড়িতে এত ঘর থাকতে ঐ ঘরে কেন থাকত তুলসী গোপীনাথ কাকা? দরজাটা এত ছোট যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে বেরুতে হয়। অত কষ্ট করে ও ঘরে থাকবার উদ্দেশ্য কি তাই ভাবছি।”

“উদ্দেশ্য!” গোপীনাথ আর একটু কাছে সরে এল বরুণের। খুবই একটি গোপনীয় কথা বলছে, এইভাবে বলতে লাগল—“ভূতুড়ে ঘর ওখানা ছোটবাবু, ও ঘরে ভূত নামানো হয়। নিজের চোখে না দেখলে সে সব আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। ঐ তুলসী ঠাকরুণ, ওর ঘাড়ে ভূতে ভর করে। তখন ওকে কি রকম দেখতে হয় জানেন, আস্ত ডাইনী। এই এত বড় বড় হোয়ে যায় চোখ দুটো, এই এতখানি জিভ বেরিয়ে পড়ে, আর এই এমনি এমনি করে ছলতে থাকে। আসল ভূতুড়ে কাণ্ড ছোটবাবু, এখনই ঐ আপদকে বিদায় করুন। ঐ পাপকে কি বাড়িতে ঢুকতে দিতে আছে।”

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল বরুণের। তুলসীর চোখ দুটো কত বড় হোয়ে যায় তা বোঝাবার জন্তে গোপীনাথ নিজের হাত দিয়ে এমন একটা পরিমাণ দেখাল যা টেনিশ বলের চেয়ে অনেক বড়। জিভ কতখানি বেরিয়ে পড়ে তা বোঝাবার জন্তে ডান হাতের চেটো মেলে ধরলে। আর ছলুনিটা দেখাবার জন্তে নিজেই প্রচণ্ড বিক্রমে ছলতে লাগল। ব্যাপারটা দেখে মনে মনে মানতে বাধ্য হোল বরুণ যে আসল ভূতুড়ে কাণ্ডই বটে। কষ্ট করে হাসি চেপে পরামর্শ করতে লাগল গোপীনাথের সঙ্গে—“তাই তো ভাবছি গোপীনাথ কাকা, কি করে এখন তাড়ানো যায় ওকে! গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়াটা কি ঠিক হবে! হাজার হোলেও মেয়েমানুষ তো। আর তা’হাড়া তাড়াবার হয়তো দরকারই হবে না। নিজে থেকেই হয়তো পালিয়েছে।”

“মেয়ে মানুষ!” গোপীনাথও মহাভাবনায় পড়ে গেল—“আজ্ঞে হাঁ, মেয়েমানুষ তো বটেই। শুধু মেয়েমানুষ নয়, ডাইনী। ওকে জব্দ করতে পারে মঠের সেই বুড়ো সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গেই উনি তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পালায়নি সে ছোটবাবু, এই



বাড়িতেই কোথাও নুকিয়ে আছে। ডাইনী তো ইচ্ছে করলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে দিব্যি কয়েক ঘণ্টা কাটাতে পারে।”

দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেল বরুণ, একেবারে নাচার হয়ে পড়ল যেন। বলল—“তাহলে কি হবে গোপী কাকা? এ তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হোল দেখছি। এখন সেই বুড়ো সন্ন্যাসীকেই বা পাওয়া যায় কোথায়?”

ছেলেমানুষ মনিবটিকে অভয় দিয়ে গোপীনাথ বলল—“অত ভাবছেন কেন ছোটবাবু। আমিই করব ব্যবস্থা। এমন ব্যবস্থা করছি যে বাপ বাপ বলে ওঁকে বিদেয় হোতে হবে। আমার নাম গোপীনাথ গড়গড়ি—হুঁ হুঁ—”

খুব বেশী নির্ভয় হোলেন কি না মনিবটি বোঝা গেল না। বাইরের রোয়াকে পৌঁছে গেছে তখন ছুঁজনে। একটা বন্ধ জানলা দেখিয়ে দিয়ে গোপীনাথ বলল—“ঐ সেই দরজা।”

“ঠিক তো? ভুল হয়নি তো তোমার?” জিজ্ঞাসা করল বরুণ।

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে কি যেন বলতে গেল গোপীনাথ, বরুণ বাধা দিল। বলল—“ঠিক আছে যাও তুমি, গেট থেকে একজন দরওয়ানকে পাঠিয়ে দাওগে। তাড়াতাড়ি আসতে বলবে।”

গোপীনাথ চলে যাবার পর এগিয়ে গিয়ে খড়খড়ির ওপর কান চেপে দাঁড়াল। এতটুকু সাড়াশব্দ পেল না। প্রত্যেকটা খড়খড়ি ওপরদিকে তোলবার জন্যে চেষ্টা করলে তখন, সম্ভব হোল না। সরে দাঁড়িয়ে খড়খড়ি লাগানো পাল্লা দুখানার পানে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

হঠাৎ একটু আওয়াজ হোল—খট্ খট্ খটাস। সঙ্গে সঙ্গে একখান পাল্লা খুলতে লাগল বাইরের দিকে। অল্প একটু ফাঁক হবার পরে একখানা হাত বেরিয়ে এল। কনুই পর্যন্ত বেরিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল হাতখানা, বাইরের দিকে কিছু যেন ধরবে। কিছুই

ঠেকল না হাতে, তাই বোধ হয় পাল্লাটা আরও খানিক ফাঁক হোল। সেই ফাঁক দিয়ে গলে যে বেরিয়ে এল বাইরে, তার মুখ পানে তাকিয়ে সত্যিই বুক কেঁপে উঠল বরুণ সেনের, এক পা নড়বার সামর্থ্য পর্যন্ত রইল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল সেই প্রেতের চাউনির পানে তাকিয়ে। সামনের দিকে ডান হাতখানা লম্বা করে বাড়িয়ে প্রেতিনী পা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে, হাতখানা শেষ পর্যন্ত ওর বুকের ওপর ঠেকল। খামচে ধরল ওর সার্টটা, ধরে পিছিয়ে যেতে লাগল। টানের চোটে বরুণ তখন এগিয়ে যেতে লাগল। ওরও তখন চোখের পাতা পড়ছে না, একভাবে প্রেতিনীর অতি অস্বাভাবিক চোখ ছটির ওপর তাকিয়ে আছে।

সর্বশেষে ছ'জনেই অদৃশ্য হোল। সেই অল্প ফাঁক দিয়ে গলে পিছু হেঁটে আগে ঢুকল প্রেতিনী, সঙ্গে সঙ্গে বরুণ সেনকেও যেতে হোল, কারণ বুকের কাছে সার্টটা যে খামচে ধরে আছে।

আরও কয়েক মিনিট পরে দরোয়ানটি এল সেখানে। এসে হুজুরকে দেখতে পেল না। বোধ হয় হুজুর ওপরে নিজের ঘরে ফিরে গেছেন এই ভেবে সে স্থানত্যাগ করলে।

বাইরে আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না বরুণ। খানিক পরে অন্ধকারটা সয়ে গেল চোখে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথায় এসেছে।

ঘরখানি নেহাত ছোট নয়, কিন্তু অত্যধিক বেঁটে। হাত উঁচু করলে কড়ি বরগা ছোঁয়া যায়। দরজা না খুললে ঘরে আলো হাওয়া ঢুকতে পারে না। ছ'হাত উঁচু থোড়ের মত মোটা একটা মোমবাতি জ্বলছে এক কোণে। তাতে সেই কোণটাই শুধু আলো হয়েছে, বাকী সব আবছা অন্ধকার। খুব মুছ একটা গন্ধ গেল নাকে, গন্ধটা কিসের বুঝতে পারল না। একটু পরে মনে হোল, মাথার ভেতর যেন বিম বিম করছে। হাত পা সর্বশরীর ক্রমেই অবশ হোয়ে পড়তে



লাগল। আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল—কোথায় গেল তুলসী!

সেই মুহূর্তে এক অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে পেল। বহুদূর থেকে চোঙে মুখ লাগিয়ে কে যেন কথা বলছে। বার দু'য়েক গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনবার পর বুঝতে পারল, বার বার তার নামটাই বলা হচ্ছে।

“বরুণ বরুণ।”

“বরুণ, সাড়া দে। বুঝতে পারছিস আমার কথা? যদি বুঝতে পারিস জবাব দে।”

চমকে উঠে কোন রকমে উচ্চারণ করল—“হাঁ হাঁ, শুনতে পাচ্ছি। তুমি কে? কোথা থেকে বলছ?”

তৎক্ষণাৎ জবাব পেল—“আমি তোরা দাছ, জ্ঞান সেন। খবরদার, ভয় পাবি না। যা বলছি ভাল করে শোন! বেশ মন দিয়ে শুনবি—কেমন? ভয় পাবি না তো?”

“না না ভয় পাব কেন?” প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠল—“কিন্তু কোথায় তুমি? তৌমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে।”

প্রাণপণ চিৎকারটা নিজের কানেই ফিসফিস করে উঠল। দাছ জবাব দিলেন তৎক্ষণাৎ—“আমাকে দেখতে পাবি কেমন করে, আমার কি দেহ আছে। যা বলছি শোন, এ সব ব্যাপার তোরা বাবা কাকারাও জানে না। তোরা ঠাকুমাও জানতে পারেনি কোনও দিন। তোরা জানিস যে সুবর্ণ বণিক তোদের জাত, তোদের পূর্বপুরুষরা হুগলী জেলার কোন এক গাঁয়ে বাস করত। এটা ভুল, আমিই ঐ মিথ্যে পরিচয়টা চালিয়েছিলাম। কেন চালিয়েছিলাম সেটা পরে বলছি। আগে তোদের আসল বংশ পরিচয়টা শুনেনে।”

শুনতে লাগল বরুণ সেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। জ্ঞানপ্রকাশ সেন তাঁর পৌত্র বরুণ সেনকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের জাত সুবর্ণ বণিক নয়, তাঁরা বাঙলা দেশের মানুষই নন, ভারতের উত্তরপশ্চিম অংশে

তাদের আদিপুরুষরা বাস করতেন এবং তাঁদের ধমনীতে পবিত্র ব্রাহ্মণ  
বংশের রক্ত প্রবাহমান। নিজের বাপের, মানে আসল বাপের নামটিও  
বললেন জ্ঞানপ্রকাশ। নামটি হোল দৈবকীনন্দন মিশ্র। দৈবকীনন্দন  
মিশ্রের পুত্র জ্ঞানপ্রকাশ নিজের আসল নামটিও জানালেন—ধেয়ান-  
চাঁদ মিশ্র। এই পর্যন্ত পরিচয় দিয়ে আসল কাহিনীটি শোনাতে  
লাগলেন।

“আমার বয়েস যখন সাত আট বছর তখন আমাকে চুরি করে  
আনা হয় কলকাতায়। যারা আমাকে চুরি করে তারা বেদে। আমাকে  
চুরি করার জন্তে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকাটা দেন  
আমার কাকা গঙ্গানন্দন মিশ্র। আমার বাবার একমাত্র সন্তান ছিলাম  
আমি। আমি মলে সমস্ত সম্পত্তি আমার কাকার ছেলেরা ভোগকরবে  
এই আশায় কাকা ঐ ব্যবস্থাটি করেন। একটি শিকড় গুঁকিয়ে অজ্ঞান  
করে ফেলে বেদেরা আমাকে নিয়ে আসে। কাকার সঙ্গে কথা ছিল  
যে তারা আমাকে মেরে ফেলবে। বেদেরা সেটা করেনি। তার বদলে  
তারা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়।

যিনি কিনলেন, তাঁর নাম রাখালচন্দ্র সেন। এঁর ছেলে মেয়ে  
ছিল না, পরের ছেলেকে কিনে নিজের ছেলে বলে চালাতে চাইলেন।  
ওঁর আত্মীয় স্বজনরা ক্ষেপে উঠল। আইন অনুযায়ী পোষ্যপুত্রকে  
সম্পত্তি লিখে দিয়ে মরবার বাসনা ছিল তাঁর, সে সুযোগই পেলেন  
না। ঐ সমস্ত করবার আগেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাঁকে বিষ  
খাওয়ানো হয়েছিল।

জীবনের প্রথম দশটা বছর পার হবার আগেই দু'দু'বার আমি  
পিতৃহারা হোলাম।

তারপর যাঁর কাছে আমি আশ্রয় পেলাম তিনি রাখালচন্দ্র সেন  
মশায়ের রক্ষিতা ছিলেন। তখনকার দিনে বড়মানুষে উপপত্নী  
রাখতেন যথেষ্ট মানমর্যাদার সঙ্গে। উপপত্নীকে বাড়ি কিনে দিতেন।  
সেই বাড়িতে ঝি চাকর দরোয়ান মোতায়েন হোত। এমন সাংঘাতিক



আবরু ছিল উপপত্নীদের যে অণু কোনও পুরুষে তাঁদের ছায়া দেখতে পেত না। গঙ্গাস্নান করবার প্রয়োজন পড়লে চারজন বা মশারির চার কোণ ধরে গঙ্গায় নেমে দাঁড়াত। সেই মশারির মধ্যে পালকি স্নান বড়মানুষের রক্ষিতাকে ঢোকানো হোত। বেয়ারারা মশারির বাইরে চলে আসত। তখন তিনি পালকির দরজা খুলে গঙ্গায় ডুব দিতেন। স্নান করে পালকির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করবার পর মশারি তুলে নেওয়া হোত। তখন বেয়ারারা গিয়ে পালকি কাঁধে তুলত। যার কাছে আমি আশ্রয় পেলাম তাঁর জীবনটাও ঐ জাতের সাংঘাতিক আবরুর মধ্যে কেটেছে। রাখালচন্দ্র দেহরক্ষা করবার পর তিনি আমাকে পেলেন। আমাকে পেয়ে আবরু বর্জন করলেন। থান পরে ছেলের হাত ধরে তীর্থযাত্রা করলেন। ইনিই আমার মা। যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তাঁকে আমি ভুলে গেছি! তারপর থেকে আমি বলতে শিখলাম, আমার বাবার নাম রাখালচন্দ্র সেন, মায়ের নাম ভুবনমোহিনী দেবী। আমার ছেলেরা, তোর বাবা কাকারা ঐ পরিচয়টাই জানে। তোরাও তাই শিখেছিস।”

একটানা বলতে বলতে হঠাৎ ছেদ পড়ল, নিস্তব্ধ হোয়ে গেল ঘর। পুরো একটা মিনিটও অপেক্ষাকরতে পারল না বরুণ সেন, কেমন যেন দম আটকে এল তার। চিৎকার করে উঠল—“কি হোল। কি হোল দাছ? কোথায় গেলে?”

সাদা দিলেন দাছ—“এইখানেই আছি। দাঁড়া, গুছিয়ে নি সব। এখন তোকে কোনখান থেকে শোনাব তাই ভাবছিলাম। তারপর কেমন করে বড়মানুষ হোলাম সেটা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। মোটের ওপর এইটুকু জেনে রাখ যে চোদ্দ বছর বয়েসে পেটের দায়ে আমি জাহাজের গায়ে রঙ দেবার কাজে লাগি ছ’আনা রোজে। যোল বছর বয়েসে প্রথম একখানা জাহাজ রঙ করবার ঠিকা পাই। তারপর থেকে ঐ ঠিকাদারের কাজই করতে থাকি। আঠার বছর বয়েসে তোর ঠাকুরমাকে বিয়ে করি। তোর ঠাকুমা খাঁটীসোনার বেণের মেয়ে।

রাখাল সেনের ছেলে আমি, কাজেই সোনার বেণের ঘরে বিয়ে হয়। তারপর কি থেকে কি হোল সে আর তোকে শুনিয়ে কাজ নেই। তোর বাবা কাকারা পিসীরা একে একে জন্মাল, তোর ঠাকুমা মলেন। তোর বাবার বিয়ে দিলাম, তোর পিসীদেরও বিয়ে হোয়ে গেল। শেষে তোর কাকার বিয়ে দিয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে এলাম।

ঠিক জানি না, টাকাকড়ি সম্পত্তি সব বিলিয়ে দিয়েছি বলে আমার ছেলে মেয়েদের মনে কোনও আক্ষেপ আছে কিনা। তুই তো আমার নাতি, বড় নাতি। দাচ্ তোকে কিছু দিয়ে যায়নি বলে তোর খুব দুঃখ হয়, না? কিরে, জবাব দিচ্ছিস না যে?”

বরুণ বলল—“সম্পত্তি তোমার, নিজে রোজগার করেছিলে। তোমার সম্পত্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে গেছ, তাতে আমার মন খারাপ হবে কেন?”

আবার চুপচাপ। বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করে বরুণ বলল—  
“কি হোল? সাড়া দিচ্ছ না যে?”

জ্ঞানপ্রকাশ সাড়া দিলেন। বরুণ বুঝতে পারল ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে যেন তাঁর কথা বলতে। থেমে থেমে খুব চাপা স্বরে বলতে লাগলেন—“এখন আমি চলে যাব, খুব বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকা সম্ভব নয়। মেয়েটার বিপদ ঘটতে পারে। শোন বরুণ, আমি তোকে এমন কতকগুলো ব্যাপার জানাব—আচ্ছা, এখন থাকুক। তুই পারবি, তোর বাবা কাকা পিসী সবাইকে তুই বাঁচাতে পারবি। শয়তানরা এখনও চেষ্টা করছে চরম সর্বনাশ করবার। ঠিক আছে, আমি চললুম। মেয়েটাকে সুস্থ করবার চেষ্টা কর এখন, বাইরে হাওয়ায় নিয়ে গিয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দে। ওকে হাতছাড়া করিসনে। ওকে হাতছাড়া করলে আমার কথা আর শুনতে পাবি না। রাত্রে এই ঘরে আবার—”

শেষটুকু বরুণ শুনতে পেল না, আওয়াজটা কমতে কমতে একদম মিলিয়ে গেল।



কতকটা বেহুঁশ অবস্থায় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে  
ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা কমে এল। মনে হোল, এতক্ষণ যেন শ্বাস  
প্রশ্বাস বইছিল না। হাওয়া চাই, দম আটকে মরবে নাকি সে!  
গেল কোথায় তুলসী! তাকেও যে হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

এধার ওধার তাকাতেই দেখতে পেল। বাতিটা যেখানে জ্বলছে  
তার উলটো দিকের কোণে পেছন ফিরে বসে আছে। কিন্তু ও  
রকম ভাবে আছে কেন!

এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল—“শুনছেন, কি হোল আপনার?”

সাদা পেল না।

তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। নিচু হোয়ে একটা কাঁধ খামচে ধরে  
নাড়া দিল সজোরে। কাঁধ ছেড়ে দিতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ল তুলসী।  
বুঝতে পারল তখন ব্যাপারটা। ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল  
আগে, বাইরের আলো ঢুকল ঘরে। কিন্তু দেখে কে তখন ঘরে কি  
আছে না আছে। তিন লাফে ফিরে এসে টেনে তুলল ওকে। তুললে  
হবে কি, একদম বেহুঁশ, হুঁশ নেই যার সে কি করে নিজের পায়ে  
খাড়া থাকবে। অগত্যা বয়ে নিয়ে যেতে হোল বাইরে। রোয়াকে  
শুয়িয়ে দিয়ে আবার ঢুকল ঘরে। জল চাই, চোখে মুখে জলের  
ঝাপটা দিতে হবে।

ঘরে জল নেই, কলসী বালতিও পেল না। ছুটল ডোবার দিকে,  
গায়ের জামা ভিজিয়ে জল আনতে হবে।

জামা ভিজিয়ে এনে দেখল উঠে বসেছে। মুখের পানে তাকিয়ে  
ঘাবড়ে গেল। অস্বাভাবিক বড় হোয়ে উঠেছে দুই চোখ, ঠেলে  
বেরিয়ে আসছে যেন। ইঞ্চিখানেক জিভও বেরিয়ে রয়েছে, জিভটা  
কামড়ে রয়েছে বলে মনে হোল। মিনিট খানেক মুখ পানে তাকিয়ে  
থাকবার পর লাফ দিয়ে উঠল রোয়াকে, উঠে ভিজে জামাটা ওর চোখ  
মুখের ওপর চেপে ধরল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কয়েকবার কঁপে উঠল

তুলসী। তারপর ছ'হাত তুলে ওর হাত ছ'খানা ধরে সরিয়ে দিলে।

“চল ওপরে”—একান্ত আপন জনকে যে ভাবে বলে মানুষে সেই ভাব বলল বরুণ।

অল্প একটু মাথা নেড়ে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল তুলসী—“না।”

গলার ভেতরটায় কি যেন আটকে গেল বরুণের। চেষ্টা করে আবার বললে—“ওপরে চল। চাকর দরোয়ানরা দেখলে কি বলবে। কথা শোন—”

“আমি যুমব।” সত্যিকারের আধা যুমন্ত মানুষের মত করে বলল তুলসী।

“সেই জন্মেই তো বলছি, ওপরে চল।” আবার অনুরোধ করল বরুণ।

“না, ঐ ঘরে শুয়ে যুমব।” তুলসী ছেলেমানুষের মত আবদার করতে লাগল—“আমাকে যুমতে দাও, আমি যুমব, আমায় ছেড়ে দাও।”

অসহায় বরুণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না।

ঘাড় হেঁট করে অনেকক্ষণ একভাবে বসে রইল তুলসী। শেষে মেঝেতে ছ' হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

বরুণ আর থাকতে পারল না চুপ করে, নিচু হয়ে আবার ধরতে গেল ওকে। ঠিক পেছনে কে বলে উঠল—“সরে দাঁড়ান তো ছোটবাবু, আপনি পারবেন না, যা করতে হয় আমি করছি।”

ফিরে তাকিয়ে দেখল মল্লিকার মা। মল্লিকার মা ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল তুলসীর পেছনে, ছোটবাবুর পানে না তাকিয়ে বলল—“আপনি যান এখন, এক ঘণ্টা পরে দিদিমণি ঠিক হোয়ে যাবেন। আমি জানি এখন কি করতে হবে। দেবতার ভর হোয়েছিল, এ রকম হয় মাঝে মাঝে। ভয় পাবার কিছু নেই।”



“ওপরে নিয়ে যাওয়া যায় না মল্লিকার মা?” ভয়ানক ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করল বরুণ।

মল্লিকার মা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—“এখন নয়।”

“কোথায় থাকবেন উনি তা’হলে?”

“ঐ ঘরে, তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরে শুয়িয়ে দোব। গুগ্‌গুল জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিতে হবে। ধোঁয়া দিতে দিতে নিজে থেকে উঠে বসবেন।” বলে মল্লিকার মা পেছন থেকে জাপটে ধরল তুলসীকে। ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘরে পুরল। একটু পরে পাল্লা ছ’খানা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে। ভেতরে ছিটকিনি লাগানোর শব্দও বরুণ শুনতে পেল।

কি আর করবে তখন বেচারী। মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে গেল।

কে বললে ঐ কথাগুলো !

দাছু বললে !

শেষ পর্যন্ত তাকে এই সমস্ত ছাইপাঁশ বিশ্বাস করতে হবে !

ওপরে উঠে অনবরত পায়চারি করতে লাগল লম্বা দালানে আর নিজেকে নিজে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বিশ্বাস করতে হবে ! মরে যাবার পরে ভূত হয়ে এসে তার দাছু জ্ঞানপ্রকাশ সেন যে জ্ঞান দান করলেন সেটাকে সত্যি বলে সে মেনে নেবে ! তার মানে, ছুনিয়া সুদ্ধ মানুষও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে যে বরুণ সেনের মাথার দোষ হয়েছে । ছোটকা অমনি ব্যবস্থা করবে রাঁচী পাঠাবার । মাথায় মধ্যমনারায়ণ তেল মাখাবে, বড়ি খাইয়ে দিবারাত্র ঘুম পাড়িয়ে রাখবে । সব চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপারহোল, যদি সে প্রতিবাদ করে, যদি বলে যে মোটেই তার মাথাথারাপ হয়নি, তা'হলে সেটাকেই পাগলামির সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে মনে করে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে ফেলে রাখবে । মারপিট জোর জুলুম চালাবেই । চিকিৎসা করতে হবেতো, বাড়ির বড় ছেলেটা পাগল হয়েছে, আত্মীয়স্বজন চিকিৎসাকরতে ছাড়বে কেনা

ভয়ঙ্কর অবস্থা যাকে বলে !

অতএব এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঐ ভূতুড়ে কাহিনীটা সে বিশ্বাস করবে না । বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠেছে না, শ্রেফ ধাপ্পা । ভয়ঙ্কর চালাক ঐ তুলসী, সাংঘাতিক রকম একটা খারাপ মতলব আছে ওর পেটে । খুব সম্ভব, যে হিপ্পনটিজ্‌ম্ মেজ্‌মেরিজ্‌ম্ ব্যাপারগুলো



ইংরেজী নভেলে দেখা যায়, এই বোধ হয় সেই জিনিষ। ঐ অন্ধকার ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে হিপ্‌নটাইজ করেছিল তাকে তুলসী। সেই অবস্থায় যা শুনিয়েছে তাই সে বিশ্বাস করে বসে আছে।

“ওকে হাতছাড়া করিসনে, ওকে হাতছাড়া করলে আমার কথা আর শুনতে পাবি না—” দাছু বলে গেল।

তার মানে !

ওর মুখ দিয়েই সমস্ত বলেছে দাছু। আসল চালাকিটা হোল এইখানেই। ওর মুখ থেকে সমস্ত শুনতে হবে। কেন ! এতই যদি গরজ তোমার নিজই শোনাও না কেন। এই তো একলা হেঁটে বেড়াচ্ছি বারান্দায়, এখন শোনাচ্ছ না কেন কানে কানে ! রাত্রে ঐ ঘরে গিয়ে ওর মুখ থেকে শুনতে হবে। দায় পড়েছে আর একবার ঐ ঘরে যেতে। বরুণ সেন অত কাঁচা ছেলে নয়।

শোনাল কিন্তু খুবই অদ্ভুত কাহিনী।

জ্ঞানপ্রকাশ সেন হোলেন ধেয়ানচাঁদ মিশ্র এবং ধেয়ানচাঁদ মিশ্র হোলেন দৈবকীনন্দন মিশ্রের বংশধর। বেচারি রাখালচন্দ্র সেন, সেন মশায়ের বংশে বাতি দিতে কেউ আর রইল না। এই মুহূর্তে যদি শোনায় তাদের নতুন বংশ পরিচয়টা তার বাবা কাকাদের। যদি জ্ঞানপ্রকাশের পুত্র তিনটিও এই গল্পটা বিশ্বাস করে বসেন, তা’হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় !

সোনার বেণের মেয়েকে বিয়ে করেছিল জ্ঞানপ্রকাশ, ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন জাত সোনার বেণের ঘরে, কতগুলো সোনার বেণের সংসারে লাগবে এখন হলুস্কুল কাণ্ড ! তার নিজের মাতুল গুপ্তির কথা মনে পড়ল। লোহা লক্কর বেচে ছ’খানা মোটর গাড়িই কিনে ফেলেছে তারা। এখনই ছুটে আসবে ঐ কথা শুনে। তারপর আসবে তরুণের মামারা, আসবে দুই পিসেমশাই। মার মার করে সবাই তেড়ে আসবে। প্রমাণ হোয়ে যাবে যে জ্ঞানপ্রকাশ লোকটা পহেলা নম্বরের জোচ্চর ছিল। জোচ্চুরি করে সোনার বেণেদের জাত

মেয়েছে ! স্মৃতির নাও প্রতিশোধ । জোচ্চরটার ছেলে মেয়ে নাতি  
নাতিদের ওপর প্রতিশোধ নাও, বংশটাকে ছারখার করে দাও ।

সর্বনাশের পরিমাণটা কল্পনা করে বার বার শিউরে উঠল । সঙ্গে  
সঙ্গে সাবধান করে দিল নিজেকে—‘বরুণ সেন সাবধান, খুব সাবধান,  
ঐ আজগুবি ব্যাপারটা ভুলে যাও । ঐ পাপ তুলসীকে অবিলম্বে  
তাড়াও । খবরদার, তোমার বাবা তোমার কাকারা তোমার পিসীরা  
তোমার তিনটে ভাই বোন, সকলের জীবন বিধিয়ে তুল না । ছারখার  
হোয়ে যাবে, যদি ঘৃণাকরেও এই সব কথা প্রকাশ পায়, তা’হলে  
তোমাদের সোনার সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে ।’

স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে বার বার প্রতিজ্ঞা করল, জান যায় সেও ভি  
আচ্ছা, তবু তার মুখ থেকে কখনও কেউ ঐ সর্বনেশে কাহিনীটা  
শুনতে পাবে না ।

তার মানে—ভুলতে হবে । যে কোনও উপায়ে হোক তার নিজের  
মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে ঐ জঞ্জাল । ভুলতেই হবে,  
ভুলতেই হবে । স্বপ্ন দেখেছিল সে, তাকে হিপ্‌নটাইজ করা হয়েছিল ।  
শ্রেফ ধাপ্পা, আগাগোড়া সমস্ত শয়তানী । সত্যিকারের শয়তানী হোল  
ঐ তুলসী । গোপীনাথ যা বলেছে সেইটেই খাঁটী কথা । ঐ শয়তানী  
দাছুর মাথাটা চিবিয়েছিল, তার মাথাটাও চিববার চেষ্টা করছে ।  
তাড়াতে হবে ওকে, দূর করে দিতে হবে ! এই বাড়িতে তালা বন্ধ  
করে পালাতে হবে ।

কিন্তু !

এইবার সত্যিকারের বিপদটাকে দেখতে পেল । বিপদটা দেখতে  
পেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল । ধর ঐ তুলসীর সঙ্গে তার বাবার বা  
কাকাদের কারও সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল । ঐ ডাইনী তাদেরও



হিপ্‌নটাইজ্ করে ঐ সর্বনেশে কাহিনীটা বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লে—  
তখন !

ওকেই শেষ করে দিলে কেমন হয় !

এই বাড়িখানাকে আর ঐ তুলসীকে একসঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে যদি  
সে সেরে পড়ে, এমন ভাবে সেরে পড়ে যাতে তার বাবা কাকারা সবাই  
বিশ্বাস করে যে বরুণও বাড়ি চাপা পড়ে মরেছে, তা'হলে সব দিক রক্ষা  
পায়। এটা এমন কিছু শক্ত কাজ না তার পক্ষে, মোটেই অসম্ভব  
ব্যাপার না। গোটাকতক জিনিষ যোগাড় করে আনবার জন্তে  
কলকাতা বা বম্বাই যেতে হবে একবার। মাত্র সাতটি দিন সে বাইরে  
যাবে। কোনও রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঐ সাতটা দিন এই বাড়িতে  
রাখতে হবে তুলসীকে। তারপর একদিন গভীর রাতে বুম্‌ বুম্‌।  
ব্যস—একদম সাফ। পরদিন সকালে যারা দেখতে আসবে তারা হাঁ  
হোয়ে থাকবে ! বাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই ; যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে  
ইট বালি চুন স্মৃকির ছোট খাট একটা পাহাড় বসে আছে। সেই  
পাহাড় সরিয়ে খুঁজে পাবে একটা কঙ্কাল। কঙ্কালটা মেয়ের না  
পুরুষের কে যাচ্ছে যাচাই করতে। ধরে নেবে বরুণই চাপা পড়েছে।  
হাস্তান্না চুকে যাবে।

ডিনামাইট বানাতে কি কি মসলা লাগে, কোথা থেকে সেগুলো  
যোগাড় করা যাবে তাই নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল। কিছুটা শান্ত  
হোল মেজাজ, মতলব একটি ঠিক করা গেছে, কুৎসিত ব্যাপারটাকে  
এইখানেই টুঁটি টিপে শেষ করা যাবে।

কিন্তু !

আবার একটি কিন্তু উদয় হোল। কিন্তু দাছ যে বলল, শয়তানরা  
এখনও চেষ্টা করছে চরম সর্বনাশ করবার ! কি সেটা ! সেই  
শয়তানরাই বা কারা ! কি তাদের পরিচয় !

দাছ বলে গেল—তুই পারবি, তোর বাবা কাকা পিসী সবাইকে  
তুই বাঁচাতে পারবি।

কি করে !

মায় তুলসী বাড়িখানাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলে সেই অচেনা অজানা শয়তানদের শত্রুতা থেকে কি করে বাবা কাকা পিসীদের রক্ষা করা যাবে !

অস্থির হোয়ে উঠল আবার, শুরু হোল আবার পায়চারি। কি করবে সে এখন ! আবার যাবে সেই ঘরে, গিয়ে ঐ শয়তানী তুলসীর খপ্পরে পড়বে ! না না না, ঐ সব ভূতুরে কাণ্ড সে বিশ্বাস করে না, একদম তিলমাত্র বিশ্বাস করে না। মনে মনে চিৎকার করে শাসন করল নিজেকে—বরুণ সেন, তুমি না ম্যারীন্ এন্জলিনিয়ার ! তুমি না সাত সমুদ্র বার বার পাড়ি দিয়েছ ! ছনিয়ার সব কটা বন্দরে নেমেছ তুমি, বিশাল ধরণীর কত কি দেখেছ শুনেছ জেনেছ। ঐ সব আজগুবি কাণ্ডকারখানা তুমি বিশ্বাস করবে ! ভূত প্রেত আছে বলে তুমি মানবে ! সামান্য একটা মেয়ে—ঐ তুলসী—ও কিনা তোমার মত মানুষকেও ভূতুরে নাচ নাচাবে।

কিছুতেই নয়, কোনও মতেই আর একবারও ঐ ঘরে সে যাবে না ফাঁদে পা দিতে। সব ধাপ্পা। বিলকুল তাকে বিশ্বাস করানো হোয়েছে সম্মোহিত করে। ঐ ডাইনী ঐ শয়তানী ঐ তুলসী, এমন শিক্ষাই দিতে হবে ওকে—

কিন্তু !

আবার সেই কিন্তু। কিন্তুর গর্ভে আবার একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল। জানতেই হবে যে, শুনে নিতেই হবে একটিবার—কারা তারা। তাদের পরিচয় কি ? কি ভাবে তারা দুশমনি করতে চায় সেন গুপ্তির সঙ্গে ? সেই কথাগুলো আবার মগজের ভিতর পাক খেতে লাগল—“শোন বরুণ, তোকে আমি এমন কতকগুলো ব্যাপার জানাব—তুই পারবি—তোরা বাপ কাকা পিসী সবাইকে তুই বাঁচাতে পারবি।”

হুপুর গড়িয়ে গেল। গোপীনাথ উপরে উঠে এল স্নান আহারের



জগ্গে তাগিদ দিতে। জিজ্ঞাসা করল, মল্লিকার মা কি করেছে।  
শুনে আশ্চর্য হোয়ে গেল যে মল্লিকার মা ভাত তরকারি নিয়ে বাড়ি  
চলে গেছে।

“বাড়ি চলে গেছে! তার মানে!”

“রোজই তো তাই যায়। ছপুর বেলা ভাত তরকারি নিয়ে বাড়ি  
গিয়ে নাতি নাতনীদের সঙ্গে বসে খায়। কি করবে ছোটবাবু, গরীব  
তো। এখানে খেতে বললে খেতে পারে না, ভাতের থালা সামনে  
নিয়ে বসলে নাতি নাতনীদের কথা মনে পড়ে যায়। তা’ যাক না,  
ছ’ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসবে।” বলে গোপীনাথ আবার তাড়া  
দিল—“বেলা যে অনেকটা হোয়ে গেল, আপনি স্নান করবেন না?”

চুপ করে রইল। কি করে সে খেতে যায় এখন। আর একজন  
যে উপোস করে পড়ে রইল, তার কি হবে! বিপদ হচ্ছে, গোপীনাথের  
কাছে তুলসীর কথা উত্থাপন করা সম্ভব নয়।

গড়গড়ি ঠাকুরের অপেক্ষা করার সময় নেই। বলল—“স্নান করে  
আমুন ছোটবাবু, ওধারে আবার দেখি গিয়ে কি করছেন ঠাকরণ।  
আমারই হোয়েছে জ্বালা, আবার উনি উড়ে এসে জুড়ে বসলেন।  
এখন কর ওঁর সেবা। ভাত তরকারি রেঁধে ধরে দিলুম সামনে,  
খেয়ে নিলে, পাপ চুকে গেল। তা’ তো নয়, এখন আমাকে খোশামুদি  
করে গেলাতে হবে। আস্ত দিনটা উপোস করে থাকবে একটা মানুষ,  
এইই বা কি করে সহ্য হয়। আমাকেও তো ছ’মুঠো মুখে তুলতে  
হবে!”

কার কথা বলছে গোপীনাথ!

হাঁ করতে যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলালে। বোবার শত্রু নেই  
এই মহাবাক্যটিকে অনেক সময় মানতে হয়। গোপীনাথ চলে যাবার  
পর আবার পায়চারি শুরু করল। একটা মস্ত বড় বোঝা যেন নেমে  
গেল ঘাড় থেকে। যাক, তা’হলে উঠেছে তুলসী, বাঁচা গেল। খেয়ে  
দেয়ে একটু সুস্থ হোক তখন দেখা করা যাবে। দেখা করে জিজ্ঞাসা

করবে, যে সমস্ত কথা তাকে শুনিয়েছে সেগুলো সত্যি না মিথ্যা।  
 মানে বোঝাপড়া একটা করতেই হবে ভাল রকম। বরুণ সেন কচি  
 খোকা নয় যে হিপ্পোটাইজ্ করে যা তাকে শোনানো হয়েছে তাই  
 সে বিশ্বাস করে বসে আছে। হেস্তুনেস্ত একটা না করা পর্যন্ত নাইতে  
 খেতে যাচ্ছে না সে। বাড়িখানা তার দাছর, স্বর্গীয় জ্ঞানপ্রকাশ  
 সেনের নাতি সে, এই বাড়িতে তার ষোল আনা অধিকার। কে একটা  
 হাভাতে মেয়েমানুষ এসে যাতা তাকে শোনাল আর সঙ্গে সঙ্গে সে  
 বাড়িখানাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতলব আঁটছে। ছিঃ।

ধিকার ধরে গেল নিজের জ্ঞান বুদ্ধির ওপর, বেড়ে গেল পায়চারির  
 বেগ। হনহন করে চলে গেল দালানের শেষ মাথা পর্যন্ত, সেইখানে  
 সিঁড়ি। ঘোরবার সময় নজর পড়ল সিঁড়ির দরজায়, তৎক্ষণাৎ ছুঁপা  
 অচল হয়ে পড়ল। ভেবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল।

দরজার এপারে এক পা দিয়ে তুলসী বলল—“কি করেছি আমি ?  
 ভয়ানক রকম হাঙ্গামা কিছু—”

ওর চোখ মুখের অবস্থা, ওর স্বর, এককথায় ওর হাল দেখে  
 সমস্তই ভুলে গেল বরুণ সেন। ডিনামাইট দিয়ে ঐ পাপকে উড়িয়ে  
 দেবার মতলব আঁটছিল খানিক আগে। কোথায় গেল মতলব,  
 কোথায়ই বা গেল প্রতিজ্ঞা। ছুটে গিয়ে ছুঁহাতে ধরে ফেলল ওর ছুই  
 কাঁধ। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলল—“ওপরে উঠে এলে! যদি পড়ে যেতে!”

চোখ তুলে ওর মুখপানে তাকাতেও পারল না তুলসী, সত্যি সত্যিই  
 যেন ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে। মুখখানা হুয়ে পড়েছে, বুকের সঙ্গে থুতনিটা  
 ঠেকে আছে। সেই অবস্থায় বিড় বিড় করে বলল—“যদি কিছু অন্যায়  
 করে থাকি সে সময়—মানে—কিছুই তখন জানতে পারি না আমি—”

বরুণ বুঝল। কি বুঝল তা বলা সম্ভব নয়। আর একটি কথাও  
 বলতে দিল না, সন্তর্পণে ওকে ধরে নিয়ে এল নিজের ঘরে। বিছানার  
 ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল—“শুয়ে থাক, আমি জ্ঞান করে আসি।  
 এই ঘরেই আমাদের খেতে দিতে বলে আসছি।”



তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার দরজার শিকল দিতে ভুল করল না।

খেতে বসে দেখল গোপীনাথ গড়গড়ির আর এক রূপ। ওর জন্তে যথাবিহিত ডাল ভাত তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এল, তুলসীর জন্তে আনল দুধ আর ভাত। একটা বড় বাটিতে দুধের ভেতর ভাত ফেলে এনে সামনে বসে চটকাতে লাগল। তারপর বাটিটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরে বললে—“চুমুক দাও গো দিদিমাণি, এটুকু গিলে ফেল চুমুক দিয়ে। পেটে কিছু বাওয়া চাই তো।”

ঠিক যেন নিজের মেয়েকে খাওয়াচ্ছে। হাত তুলে বাটিটা ধরতে চেষ্টা করল তুলসী, পারল না, হাতখানা কাঁপছে। গোপীনাথ বলল—“তুমি চুমুক দাও না, বাটি আমি ধরে আছি। এখন কিছু ধরতে পারবে কেন, ধরতে গিয়ে ফেলে দেবে। এটুকু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। সন্ধ্যার পর নিজের হাতে মুখে তুলে খেতে পারবে।”

ভাতের থালায় হাত দেবার কথা ভুলে গিয়ে মুখ টিপে দেখতে লাগল বরুণ। ছুনিয়াটা সত্যিই এক আজব চিড়িয়াখানা। এই গোপীনাথই ঐ পাপকে বাড়ি থেকে বিদেয় করবার মতলব দিচ্ছিল। এই গোপীনাথই গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করছিল যে নবাবনন্দিনীর জন্ত ও ভাত রাঁধতে পারবে না। পাছে ঐ ডাইনী ছোটবাবুর মাথাটাও চিবিয়ে বসে সেই দুশ্চিন্তায় বেচারা গোপীনাথ গড়গড়ির নিজের মাথারই ঠিক ছিল না। আজব ছুনিয়া নয়ত কি!

কয়েক চুমুক খাবার পরে মুখ সরিয়ে নিল তুলসী। অস্পষ্ট ভাবে বলল—“আর পারছি না।” গোপীনাথ বাটি নামিয়ে গেলাসটা তুলে ধরল মুখে। ছ’টোক জল খেয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

গোপীনাথও একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর গেলাস বাটি তুলে নিয়ে বলল—“এইবার শুয়ে পড় গো দিদিমাণি। খানিকটা ঘুমুলেই

তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার দরজার শিকল দিতে ভুল করল না।

খেতে বসে দেখল গোপীনাথ গড়গড়ির আর এক রূপ। ওর জন্তে যথাবিহিত ডাল ভাত তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এল, তুলসীর জন্তে আনল দুধ আর ভাত। একটা বড় বাটিতে দুধের ভেতর ভাত ফেলে এনে সামনে বসে চটকাতে লাগল। তারপর বাটিটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরে বললে—“চুমুক দাও গো দিদিমাণি, এটুকু গিলে ফেল চুমুক দিয়ে। পেটে কিছু বাওয়া চাই তো।”

ঠিক যেন নিজের মেয়েকে খাওয়াচ্ছে। হাত তুলে বাটিটা ধরতে চেষ্টা করল তুলসী, পারল না, হাতখানা কাঁপছে। গোপীনাথ বলল—“তুমি চুমুক দাও না, বাটি আমি ধরে আছি। এখন কিছু ধরতে পারবে কেন, ধরতে গিয়ে ফেলে দেবে। এটুকু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। সন্ধ্যার পর নিজের হাতে মুখে তুলে খেতে পারবে।”

ভাতের থালায় হাত দেবার কথা ভুলে গিয়ে মুখ টিপে দেখতে লাগল বরুণ। ছুনিয়াটা সত্যিই এক আজব চিড়িয়াখানা। এই গোপীনাথই ঐ পাপকে বাড়ি থেকে বিদেয় করবার মতলব দিচ্ছিল। এই গোপীনাথই গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করছিল যে নবাবনন্দিনীর জন্ত ও ভাত রাঁধতে পারবে না। পাছে ঐ ডাইনী ছোটবাবুর মাথাটাও চিবিয়ে বসে সেই হুশিচন্তায় বেচারা গোপীনাথ গড়গড়ির নিজের মাথারই ঠিক ছিল না। আজব ছুনিয়া নয়ত কি!

কয়েক চুমুক খাবার পরে মুখ সরিয়ে নিল তুলসী। অস্পষ্ট ভাবে বলল—“আর পারছি না।” গোপীনাথ বাটি নামিয়ে গেলাসটা তুলে ধরল মুখে। ছ’টোক জল খেয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

গোপীনাথও একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর গেলাস বাটি তুলে নিয়ে বলল—“এইবার শুয়ে পড় গো দিদিমাণি। খানিকটা ঘুমুলেই



শরীর ঠিক হয়ে যাবে। একশ' বার মানা করি ঐ ঘরে যেতে, বুড়োর কথা তো কানে তুলবে না। এই ভাবে কোন দিন বেঘোরে প্রাণটা যাবো”

এতক্ষণ পরে নজর পড়ল ছোটবাবুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ধমক—  
“ওকি! জুড়িয়ে পাস্তা হয়ে গেল যে ভাত।”

থতমত খেয়ে গেল বরুণ। তাড়াতাড়ি একটা বাটি ভাতের ওপর উপুড় করে—হেঁট হয়ে খাওয়া শুরু করলে। গড়গড়ি গেলাস বাটি নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, হাত ধুয়ে আসবে।

কয়েক গ্রাস মুখে তোলবার পর তাকাল সামনে। দেখল, তুলসী ঢুলছে। চাপা গলায় বলল—“ওঠ তুমি, শুয়ে পড় গে বিছানায়।”

যাকে বলল সে যেন শুনতেই পেল না।

ফিরে এল গোপীনাথ বকতে বকতে—“এই জগ্গেই বলে ছোট-লোককে নাই দিতে নেই। সময় নেই অসময় নেই এলেই হোল। হুজুর ওদের খাস তালুকের প্রজা কিনা, যখন তখন হুজুরের সঙ্গে দেখা করবে। বলে দিয়েছি বেটাদের হাঁকিয়ে দিতে। খোটা ছুঁটোরও আক্কেল নেই, যে কেউ এলেই হুজুরকে খবর দিতে দৌড়ে আসে। ছাতুখোর বেটারা—”

“কে! কারা! কাদের তুমি হাঁকিয়ে দিতে বলেছ?” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বরুণ। গোপীনাথ হাঁ করবারই সুযোগ পেল না। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুজুরটি ছুটলেন।

ওরা ছিল, ফিরে যায়নি। বরুণকে দেখতে পেয়ে ওদের মুখে হাসি ফুটল। নাথরু বলল—“খবর পেলেই তুমি ছুটে আসবে আমরা জানতাম। তাই বসে রইলাম বাইরে। এ সময় আসা আমাদের অগ্রায় হয়ে গেছে।”

“কিন্তু না এসেও উপায় নেই যে—” কুঞ্জ দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

দু'জনেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কে আগে জানাবে

সংবাদটি তাই নিয়ে যেন রেষারেষি লেগে গেল।

নাথন বলতে শুরু করলে—“বেটারা সাধু! মাথা নেড়া করলে আর লাল কাপড় পরলেই সাধু হওয়া যায়। হারামিরা পয়েলা নম্বরের শয়তান, আমরা আগেই জানতাম—”

“না না, ও কথা বলছিস কেন? আমরা গেরস্ত মানুষ, আমরা পাণী, আমরা জোর গোর নিয়ে সংসার করি। ওঁরা মেয়েমানুষের ছায়া মাড়ান না। দিন রাত খালি মস্তোর আওড়াচ্ছেন আর ঘন্টি ঘোরাচ্ছেন। ডুবে ডুবে জল খেলে—” বলতে বলতে কুঞ্জ অট্টহাস্ত জুড়িলো।

নাথন গম্ভীর মানুষ, হাসি ফাসি তার আসে না। গজরাতে লাগল বুনো জানোয়ারের মত—“বেটারা সাধু, সাধুগিরি ঘুচিয়ে দিয়েছে বলদেও। কিন্তু সরালো কোথায় মেয়েমানুষটিকে! মিশিরের লোকগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে মঠটা, তারপর আগুন দিয়েছে। মেয়েমানুষটিকে হারামিরা লুকলো কোথায়?”

কুঞ্জ বলল—“খুন করে ফেলে দিয়েছে কোনও খাদে। অত বড় পাহাড় কোথায় কোন খাদে ফেলে দিয়েছে তাকে, ওদের অসাধ্য কর্ম আছে। বেটারা আস্ত রান্ধস।”

“মঠ আর বানাতে হবে না বেটাদের, এইবার পাততাড়ি গোটাতে হবে। বলে নাথন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

এতক্ষণ পরে কথা বলবার সুযোগ পেল বরুণ। বলল—“এস, চল ভেতরে যাই। তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি।”

“খাওয়া এখন থাকুক।” কুঞ্জ এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল—“দরকারি কথা আছে। ভেতরে চল, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে এখনই আমাদের যেতে হবে।”

“হাঁ, তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। নয়ত সবাই চলে যাবে আমাদের ফেলে।” নাথন সায় দিল।

গেট থেকে ভেতরে নিয়ে এল ওদের বরুণ। একটা আমগাছ তলায় সিমেন্ট করা একটা চত্বর ছিল। বসল তিনজন সেখানে।



আশেপাশে কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নাথনু শোনাল মতলবটা—“শিকার যদি করতে চাও, তা’হলে এখনই চল তোমার বন্দুক নিয়ে আমাদের সঙ্গে। এমন শিকার করিয়ে দোব যে পায়ের ওপর পা তুলে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে।”

কুঞ্জ বলল—“একটা সিঁদুক যদি কেড়ে আনা যায় তা’হলেই কর্ম ফতে।”

আগা মাথা কিছুই বুঝতে না পেরে বরুণ মুখ বুজে শুনতে লাগল। ওরা পরামর্শ করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। বন্দুক নিয়ে যেখানে লুকিয়ে থাকবে বরুণ সেখানে ওকে পৌঁছে দেবে কুঞ্জ। ঠিক জায়গায় ওকে বসিয়ে দিয়ে এসে দলের সঙ্গে যোগ দেবে। গাঁয়ের কেউ যেন জানতে না পারে। বরুণ যে যাচ্ছে লুঠ করতে এটা কুঞ্জ আর নাথনু ছাড়া অন্য কেউ জানবে না, এই ভাবে ব্যবস্থাটা করতে হবে।

নাথনু বলল—“তুই তা’হলে এখনই বেরিয়ে পড় সাহেবকে নিয়ে, আমি গাঁয়ে যাচ্ছি। যদি কেউ খোঁজে তোকে, বলব যে বলদেও মিশিরের ওখানে আছিস তুই, ওদের হালচাল লক্ষ্য করছিস। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে যাবি।”

কুঞ্জ খিঁচিয়ে উঠল—“এতটা পথ যাব আবার ফিরে আসব? কি দরকার ফিরে আসবার। তুই বলগে যা আমি পাহাড়েই রয়ে গেছি, নজর রাখছি ওদের ওপর। ঠিক সময় তোদের সঙ্গে মিলব।”

“ঠিক আছে।” নাথনু উঠল। বরুণকে বলল—“বেরিয়ে পড় তা’হলে বন্দুক নিয়ে, দেরি কোর না।”

আবার একবার হাঁ করবার সুযোগ পেল বরুণ। বলল—“তোমাদের মতলবটা মোটে বুঝতেই পারলাম না আমি। ভাল করে শুনতে—”

“শোনার কিছুই নেই, ওরা পালাচ্ছে আজ রাতে ওদের টাকা কড়ি নিয়ে, আমরা জেনে এসেছি।” ঝাড়ের মত বলতে লাগল কুঞ্জ—“এই সুযোগ, আমরা ওত পেতে থাকব এমন জায়গায় যে অন্ধকারে

ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। মনে করবে মিশিরের লোকেরাই ঘিরে ধরেছে। তোমার হাতে বন্দুক থাকবে, অনবরত বন্দুক চালাবে। খুন জখম করতে হবে না। মালপত্র ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাবে ওরা বন্দুকের আওয়াজ শুনে। বন্দুক ওদের কাছে আছে কিনা, তাই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের হাতেও বন্দুক আছে জানতে পারলে লড়াই করতে সাহস হবে না ওদের। বুঝতে পারছ মতলবটা?”

“কিন্তু আমাদের তো একটা বন্দুক, ওদের কাছে যদি দশ বিশটা থাকে—” বুঝিয়ে বলতে গেল বরুণ।

শুনছে কে। নাথনু বলল—“ওরা জানবে কেমন করে যে একটা না পঞ্চাশটা বন্দুক নিয়ে গেছি আমরা। ওরা তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। এখার থেকে আমাদের গাঁয়ের লোকেরা তাড়া করবে, ওধারে আমরা তিনজন পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে বসে থাকব। মানে—ফাঁদে পড়ে যাবে, বুঝতে পারছ এবার?”

বুঝতে সমস্তই পারল বরুণ। বুঝেও নেহাত অবুঝের মত বলে বসল—“কিন্তু আজতো বাড়ি ছেড়ে যাওয়া হবে না আমার—”

“কেন?” নাথনুর সুরে উত্তাপ ফুটে উঠল।

কুঞ্জ বলল—“আজ রাতেই যে ওরা পালাবে ঠিক করেছে।”

“ঐ সংবাদটি ঠিক নয়।” বরুণ মাথা নাড়ল।

“ঠিক নয়! আমরা খুব ভালভাবে জেনে এসেছি—” নাথনু তেড়ে উঠল।

একটুও উত্তেজিত না হয়ে বরুণ বলতে লাগল—“যা ওরা রটাচ্ছে তাই জেনে এসেছ। তোমাদের দোষ নেই। কিন্তু পালাবে না ওরা, অল্প মতলব আছে। যে মেয়েমানুষটার জন্তে বলদেও মিশির ওদের মঠ জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেটাকে ফেলে ওরা পালাতে পারে না। কোথাও এখন আছে সেই মেয়েমানুষটা, কার কাছে আছে, এটা যদি জানতে পেরে থাকে ওরা, তাহলে আজ রাতেই তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে।”



নাথনু আর কুঞ্জ পরস্পরের মুখ পানে তাকাতে লাগল। বরুণ উঠে দাঁড়াল, নাথনুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল—“তোমরা যদি না আসতে আমিই যেতাম তোমাদের খোঁজে। আজ রাত্রে তোমাদের ছ’জনকে এই বাড়িতে থাকতে হবে। আজ রাত্রেই মঠওয়ালারা এই বাড়িতে হামলা চালাবে।”

“এই বাড়িতে মানে—এখানে—!” একসঙ্গে ছ’জনে চৈঁচিয়ে উঠল প্রায়।

“আস্তে আস্তে।” চাপা ধমক দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করল বরুণ। তারপর নিতান্ত অসহায় ভাবে বলতে লাগল—“তোমরা ছ’জন ছাড়া আর কে আছে আমার, তাই তোমাদের কাছেই আমি যেতাম। তোমরা ছ’জনেই পার আমাকে বাঁচাতে। ঐ যে দুটো দরওয়ান রয়েছে ফটকে, ওরা শুধু ডাল রুটি সাঁটতে জানে। ওদের আমি জানাতে চাই না কিছু, জানালে ওরা হয়তো ভয়ে পিটুটান দেবে। পরশু রাতে এই বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ওদের ছ’জনকে বেঁধে ফেলে রেখে ফটক পেরিয়েছিল তারা। মস্ত একটা বাক্স বা সিন্দুক নিয়ে গেছে। সেটা নেবার জন্তু লরি এনেছিল।”

“সেকি! কাল তো কিছু বলনি!” নাথনু আবার চৈঁচিয়ে উঠল।

এবার ওকে সামলালে কুঞ্জ। বলল—“থাম চৈঁচামেচি করিস না।” বরুণকে বলল—“ঠিক আছে, তোমার সঙ্গেই আজ আমরা থাকব। নাও, খাওয়াও এখন কি খাওয়াবে। খেতে খেতে সব শুনে নিচ্ছি।”

প্রথম প্রহর শেষ হলো। অনেকক্ষণ ধরে জোরে বাতাস বইছে। সন্ধ্যার আগেই ঈশান কোণে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখা গিয়েছিল, ঝড় উঠবে বোধ হয়। বিশাল বাড়িখানায় কোথাও একটু আলোর চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে একটানা ভেঁপু বাজছে যেন। ওটা বাতাসের শব্দ, বাতাস এ দালান দিয়ে ঢুকে ও দালানে পাক খেয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বন্ধ জানলা দরজার খড়খড়িগুলোও মাঝে

মাঝে নানা জাতের শব্দ করছে। বাগানে বাঁশ ঝাড়ের ভেতর থেকে কাঁচ কাঁচ আওয়াজ উঠছে। সবরকমের শব্দ মিলে মিশে একটা বেশ রহস্যময় রোমাঞ্চকর রজনী। ভারী ভাল লাগছে বরুণের, অনেক দিন পরে ঝড় জলের সঙ্গে দেখা হবে। আরও ভাল হয় যদি ছলতে শুরু করে বাড়িখানা, সমুদ্রের বুকে জাহাজ যেমন দোলে। শেষ বার কোথায় পড়েছিল ঝড়ের মধ্যে, মনে করবার চেষ্টা করল। জাপানের কাছাকাছি কোথাও হবে। হ্যাঁ, প্যাসিফিকেই একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে ঠেকেছিল জাহাজখানা তিন দিন তিন রাত পরে। ডাঙ্গায় নেমে রাশি রাশি ডাব খেয়েছিল সবাই, সবই বেশ মনে পড়ছে।

সেই রকম যদি তিন দিন তিন রাত ধরে ঝড় জল চলতে থাকে তা'হলে কেমন হয় !

খুব সম্ভব ধ্বংসে পড়বে বাড়িখানা। কবেকোন কালে তৈরী হয়েছে, ধকল সহিবার শক্তি আছে কতটুকু ! নিশ্চয়ই ধ্বংসবে। জ্যান্ত সমাধি প্রাপ্তি কপালে থাকলে আটকায় কে !

শুধু সে একলাই মরবে না, তুলসীও মরবে। মরবার পরে দু'জনে একসঙ্গে দেখা করবে দাহুর সঙ্গে। তখন তিন জনে পরামর্শ করে লাগা যাবে শত্রুদের পেছনে। একে একে ঘাড় মটকালেই হোল। এই সহজ উপায়টি কেন যে মনঃপুত হচ্ছে না দাহুর ! তুলসীর মুখ দিয়ে আমাদের সব জানাবার কি দরকার, তুমিই তো বাপু এক এক করে তোমার দুশমনদের ঘাড় মটকাতে পার। ভূত যখন হয়েছে তখন আর ভদ্রতার দরকার কি। ভূতের কাজই হচ্ছে ঘাড় মটকান, ঘাড় মটকালে তোমার নিন্দে হবে না।

ব্যাপারটা কল্পনা করতে গিয়ে দারুণ হাসি পেয়ে গেল। মাতৃবর জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশাই ভূত হয়েছে লোকের ঘাড় মটকে বেড়াচ্ছেন, এর চেয়ে মজার সংবাদ আর কি আছে। সংবাদটি রাষ্ট্র হোলে কে কি বলবে ভাবতে লাগল বসে বসে। ওধারে দ্বিতীয় প্রহরও বোধ হয় শেষ হতে চলল।



মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আলোর বলকানি দেখা যাচ্ছে। ঝড়ের দাপাদাপি ক্রমেই বাড়ছে।

এই ঝড়বৃষ্টিতে ওদের দু'জনকে ছাতে বসিয়ে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে।

যথাবিহিত সন্ধ্যার আগেই ওদের বিদায় দিয়েছিল। নিজে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গেটের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিল। সন্ধ্যার পর দরওয়ান ছটোকে ডেকে পাঠাল ওপরে। মিনিট দশেক আটকে রেখে বেশ করে সমঝে দিল যে রাত্রে নাক ডাকিয়ে ঘুমালে চলবে না, ইতিমধ্যে ওরা গেট টপকে এসে বাগানে লুকিয়ে বইল। তারপর খুব সাবধানে ছাতে তুলে দিয়েছে। সেই থেকে ওরা ছাতে আছে, কাঁড় হাতে নিয়ে তৈরী হোয়ে আছে। আজ রাত্রে গেট পেরিয়ে যে ভেতরে পা দেবে তার আর রক্ষে নেই।

কিন্তু আসবে কি এই ঝড় জলে কেউ!

কে আসবে! কারা আসবে!

জানল কেমন করে সে, যে কেউ আসবে!

নাথনু আর কুঞ্জ বিশ্বাস করেছে তার কথা। বিশ্বাস করতে বাধ্য হোয়েছে। তফাত থেকে তুলসীকে দেখিয়ে দিয়ে ওদের বলেছিল—“ঐ সেই মেয়েমানুষটা যার জন্তে বলদেও মিশির মঠ জ্বালিয়েছে। ঐ ওকেই ধরে নিয়ে গিয়ে মঠে আটকে রেখেছিল লামারা। পালিয়ে এসেছে বেচারী। ওকে বাঁচাতে হবে, কিছুতেই ওকে তাদের হাতে দেওয়া হবে না।”

নাথনু আর কুঞ্জ খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল—“জান থাকতে নয়।”

তাই ওরা জান কবুল করে বসে আছে ছাতে, এত বড় বৃষ্টিটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। না, ওরাই মানুষ। মানুষ বলেই বন্ধুর বিপদে জান দিতে তৈরী হোয়েছে সোনা দানার লোভ সামলে ওদের ঋণ কোনও মতেই শোধ দেওয়া সম্ভব নয়।

ঐ বন্ধুরা কিন্তু বিগড়ে যাবে যদি তার কথাটা না ফলে। রাতটা যদি ভালই কাটে, কেউ যদি না আসে এই বাড়িতে চুরি ডাকাতি করতে তা'হলে কাল সকালে ঐ বন্ধু দু'জনের সামনে মুখ দেখানো যাবে না। শিকার ফসকে গেল, ধন দৌলত লুটে আনত লামাদের কাছ থেকে সেটা হোল না, এতবড় একটা লোকসান মুখ বুজে সহিবে কি বন্ধুরা! বোধ হয় নয়। তার মানে বরুণ সেনের আরও দুটি শত্রু বৃদ্ধি হোল।

হোগ গে, সে জন্তে বরুণ সেন মনের দুঃখে মরে যাচ্ছে না। তবে সত্যিই তার মনথারাপ হবে যদি কেউ না আসে এই রাত্রে। কোথায় গেল তুলসী খোঁজ করবে তো তারা। পালিয়ে এসেছে তাদের খপ্পর থেকে, আর তারা চুপ করে থাকবে! এ কি কখনও হোতে পারে!

যদি ভুল হোয়ে থাকে তার! ঐ মঠে এত দিন আটকে রাখা হোয়েছিল তুলসীকে এই ধারণাটাই যদি তার ভুল হয়, তা'হলে অবশ্য অগ্নি কথা। কিন্তু ভুল হয়নি তার, তুলসী যে ঐ মঠেই ছিল এ বিষয়ে কোনও ভুল নেই। কেন ছিল, কি করছিল ওখানে এতদিন ধরে, তা বলা সম্ভব নয়। তুলসীও হয়তো তা বলতে পারবে না। কারণ ওর হুঁশ জ্ঞান ছিল না, সোজা কথায় ওকে সন্মোহিত করে রাখা হোয়েছিল।

কেন সে এই সব আজ্ঞে বাজে ভাবনা ভাবছে! কি হোল তার। সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হোল নাকি!

উঠে পড়ল। কমানো ছিল আলোটা, বাড়িয়ে দিল। ঘড়ি দেখল, দেড়টা বাজে। অর্ধেক রাত কাবার হোল, বাইরে ঝড় জলের মাতামাতি একটুও কমল না। আর আশা নেই, এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘোমে কেউ আসবে না।

এক কাজ করা যাক। বন্ধু দুটিকে নামিয়ে এনে চা খাওয়ানো যাক। ঠোঁত রয়েছে ঘরে, চায়ের ব্যবস্থা সব রেখে গেছে গোপীনাথ। আর ওদের ঝড় জলে বসিয়ে রাখা উচিত নয়।

উঠে গিয়ে ছিটকানিটা টেনে নামাল। সঙ্গে সঙ্গে কপাট দু'খানার



ধাক্কা লাগল বৃকে, পিছিয়ে যাবারও সময় পেল না, কি একটা আছড়ে পড়ল গায়ে। সেটাকে জাপটে ধরল দু হাতে, ধরে পিছিয়ে এল। দু পা পিছিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিল। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল মুখ দিয়ে—“একি!”

সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে তুলসী বলল—“অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, যুমিয়ে পড়েছিলাম।”

“কেন বেরিয়েছ ঘর থেকে? বারণ করেছিলাম না? কি করছে মল্লিকার মা?”

“যুমচ্ছে।”

“যুমচ্ছে! তার মানে!”

“সারাদিন খেটেছে, কতক্ষণ জেগে থাকবে। ও বেচারীকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ।”

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল বরুণ—“কি লাভ! দেখাচ্ছি শুকে যুমিয়ে থাকার মজাটা। পইপই করে বলে দিয়েছিলাম—”

“যে জেগে থাকতে হবে, জেগে থেকে আমাকে পাহারা দেবে। আমাকে পাহারা দিতে হবে কেন? কে বলেছে যে আমি পালিয়ে যাব?” খুবই নরম গলায় কথা কটি বলল তুলসী।

ফল হোল উলটো। সজোরে ডান পা ঠুকে বরুণ সেন হুংকার দিয়ে উঠল—“চুপ, কোনও কথা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, কেন তোমাকে ঘর থেকে বেরুতে দিলে ও। যদি কিছু হোত, যদি—”

“কি হবে?” তুলসীর স্বর একটুও বদলাল না। অবুঝ মানুষকে মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করল সে—“হবে কি আমার? অত সহজে আমি মরছি না। অনর্থক আপনি মাথা গরম করছেন।”

“অনর্থক!” আরও চড়ে গেল বরুণের গলা। মিনিট খানেক গুর মুখ পানে তাকিয়ে রইল দম আটকে। তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল—“একবার চুরি করে নিয়ে যায়নি তোমাকে? আজ— এই রাত্রে—আবার যদি তারা আসে? তুমি পালিয়ে এসেছ বলে কি

কাণ্ড ঘটে গেছে জান ? লামাদের মঠে আগুন লাগিয়েছে বলদেও মিশির, বিস্তর খুন জখম হয়েছে। ওরা যদি আবার ধরতে পারে তোমাকে—”

“আমাকে !” চোখ কপালে উঠে গেল তুলসীর, কোনও রকমে বলল—“আমাকে ! মানে আমার জন্তে ! এ সব আপনি কি বলছেন !”

সহের সীমা পার হোল বরুণের। চিৎকার করে উঠল—“কিছু জান না তুমি ! লামাদের মঠে ছিলে না তুমি—বলতে চাও ?”

তুলসী জবাব দিল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বিছানার কিনারায় বসে পড়ল। সমান জোরে সমান উত্তাপের সঙ্গে বরুণ আবার জিজ্ঞাসা করল—“জবাব দিচ্ছ না যে ? মুখ বুজে থাকলেই হাঙ্গামা চুকবে মনে করেছ ? এতক্ষণে মঠওয়ালারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে ক্রোথায় আছ তুমি। তোড়জোড় করে আসছে তারা তোমাকে ধরবার জন্তে। তোমাকে ফেলে ভাগবে না তারা, তোমার জন্তে—”

মুখ তুলে খুবই ঠাণ্ডা গলায় তুলসী জিজ্ঞাসা করল—“মঠ জ্বালিয়ে দিয়েছে বললেন না ? কারা ও কাজ করলে ?”

“বলদেও মিশির। বলদেও তোমাকে কেড়ে আনতে গিয়েছিল !

“কেন বলুন তো ?”

“কেন তা আমি জানব কেমন করে। তুমিই জান কেন বলদেও—”

“আঃ, চেষ্টাচ্ছেন কেন ?” ঝাঁজিয়ে উঠল তুলসী। চোখ কঁচকে বলতে লাগল—“আপনিই তো বললেন আমাকে কেড়ে আনতে গিয়েছিল বলদেও। অথচ কেন করতে গেল ঐ কাজটি তা জানেন না। আপনি কি ছেলেমানুষ ?”

বরুণ হাঁ করতে পারল না, একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটা ঢোক গিলে তুলসী বললে—“চলুন নিচে। জিজ্ঞাসা



করুন আপনার দাছকে, তিনিই জানিয়ে দেবেন সব। আজীবাজে সন্দেহ করে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বার দরকার কি।”

“নিচে। মানে—সেই ঘরে!” প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে বরুণ বলল—“আর একবার যাব আমি সেখানে! আমাকে সত্যিকারের পাগল ঠাওরালে নাকি?”

“তা’হলে!” উঠে দাঁড়ান তুলসী। খুবই ভাবনায় পড়ে গেল যেন। আর একবার ঐ কথাটিই উচ্চারণ করল “তা’হলে!”

বরুণ বলল—“যা হবার হোক। রাতটা পোহালে হয়, আমরা পালাব। এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব তোমাকে যে ঐ মঠওয়ালারা ঐ বলদেও মিশির এখানকার এক প্রাণী জানতে পারবে না। আর একবার সেই ঘরে যেতে পাবে না তুমি, কিছুতেই নয়। ঐ সমস্ত ভূতুড়ে কাণ্ড—” আটকে গেল কথা, বেশ একটু সময় লাগল সামলাতে উচ্ছ্বাসটাকে। তারপর বেরুল অদ্ভুত এক অনুরোধ, আকুল ভাবে জানতে চাইল—“যাবে না তুমি আমার সঙ্গে?”

কেঁপে উঠল তুলসী, কাঁপুনিটা স্পষ্ট দেখতে পেল বরুণ। একটু কাছে সরে এসে আরও ছোট্ট করে বললে—“যাবে না?”

সেই মুহূর্তে খুব জোরে ধাক্কা লাগল বাড়িটার গায়ে, আস্ত বাড়ি-খানা কেঁপে উঠল। বাড়ের ছংকার ছাপিয়ে কড় কড় কড়াৎ—একটা বুক কাঁপানো শব্দ হোল! ছ হাত তুলে নিজের ছ কান চেপে ধরে চোখ বুজে রইল তুলসী। পরপর আরও কয়েকটা বাজ পড়ল অনেক দূরে দূরে। তারপর ঝুপ্তির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

বরুণ বলল—“কাটলে হয় রাতটা কোনও রকমে। যাই, ওদের ছ’জনকে নামিয়ে আনি ছাত থেকে। এই ছর্যোগে যমও সাহস পাবে না পথে বেরুতে। গুয়ে পড়গে ও ঘরে গিয়ে। খবরদার—সকাল না হওয়া পর্যন্ত দরজা খুল না। একটা রাতের জন্তে—”

অসম্ভব রকম ভয় পেয়ে গেছে তুলসী। মাথা নাড়িয়ে বলল—

“না না, এই ঘরেই আমি থাকব। কি দোষ হবে এ ঘরে থাকলে?  
কেন আমাকে তাড়াচ্ছেন?”

একটুখানি ভেবে নিয়ে বরণ বলল—“ঠিক আছে। তা’হলে ঐ  
বিছানায়—শুয়ে থাকগে চুপচাপ। আমি ওদের নামিয়ে আনতে  
যাচ্ছি।”

“কাদের?”

“আমার দুই বন্ধু ছাতের ওপর রয়েছে। পাহারা দিচ্ছে তারা,  
বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি আসে কেউ—”

কথাটা শেষ করতে পারল না, দরজার বাইরে অন্ধকার দালানে  
দাঁড়িয়ে কে যেন নাকী সুরে অদ্ভুত কিছু আওড়াতে লাগল।  
দু’জনেই কাঠ হয়ে গুনতে লাগল, এক চুল নড়বারও কারও সামর্থ  
হোল না।

দরজার সামনে আলো আঁধারিতে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল এক  
অপরূপ আকৃতি। আকৃতিটি মানুষের, কিন্তু মোমের পুতুল যেন।  
পুতুলটি প্রমাণ মাপের নয়, অসম্ভব বেঁটে। চুল নেই, গৌফ দাড়ি  
এমন কি ভুরু পর্যন্ত নেই। ফিকে গোলাপী রঙের কোঁচকানো  
চামড়ায় ঢাকা গোলাকার মুখের ওপর নাক নেই বললেই হয়, চোখও  
নেই। যেখানে চোখ থাকা উচিত সেখানে অতি সামান্য দুটি চেরা দাগ।  
তার ওপর কপাল বলতে যাবোঝায় তা’ একদম নেই, দুধের মত সাদা  
খুলি শুরু হয়েছে। দুপাশে দুটি কান আছে কিন্তু ঠিক, মাথা মুখের  
অনুপাতে কান দুটি অস্বাভাবিক বড় এবং অনেকটা ডানার মত  
দেখতে। সেই বিচিত্র মুণ্ডটি বসে আছে আড়াই হাত উঁচু ধড়ের  
ওপর, ধড়টি গাঢ় কমলা লেবু রঙের আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা। হাত  
পা আছে কিনা তাও বোঝা যায় না।

পুতুলটি দরজা পার হোল।

পা ফেলে এগিয়ে এল বলে মনেই হোল না, কোন একটা অদৃশ্য



শক্তি যেন ঠেলে দরজার এধারে পৌঁছে দিলে। তখনও সেই গৌ-  
গৌ শব্দটা ঠিক বেরুচ্ছে।

বরুণের মনে হোল দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। ছ'এক বার  
অত্যধিক পরিমাণে মদ গিলেছিল, বেহুঁশ হয়ে পড়েনি কিন্তু  
শরীরের মধ্যে নিদারুণ একটা তাপ জন্মেছিল। সেই তাপটা বুক মাথা  
ফেটে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থাটা, ঠিক সেই  
জাতের একটা তাপ বা গ্যাস ফুলে উঠতে লাগল বুকের ভেতরে, মনে  
হোল মাথাটা বুঝি ধড়ের ওপর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। অনেক  
আঁগে থেকেই ডান হাতখানা প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো ছিল। অস্তিম  
চেষ্টায় ঝটকা মেরে বার করল হাতখানা, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে  
উঠল—“সাবধান।”

গৌ গৌ শব্দ বন্ধ হোল। উদ্ভত অস্ত্রটার ছুঁহাত সামনে দাঁড়িয়ে  
থেকেছে তখন সেই মূর্তি। একটু পরে সেটা পিছুতে লাগল। পা ফেলে  
পিছিয়ে গেল না, অদ্ভুত ভাবে সরে যেতে লাগল পিছন দিকে, সরতে  
সরতে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। রিভলবারটা এক ভাবে ধরে আছে  
বরুণ, দাঁতে দাঁত চেপে এক ভাবে তাকিয়ে আছে। দরজার বাইরে  
পৌঁছেই হঠাৎ সেই মূর্তিটার ডান ধারটা নড়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে  
একখানা হাত বেরুল আলখাল্লার ভেতর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে কি একটা  
ছিটকে এসে পড়ল দরজার এপারে। সেই মুহূর্তে ছ'বার শব্দ হোল—  
ফট্ ফট্। একটা অস্পষ্ট আর্তনাদও কানে গেল যেন। সমস্ত শব্দ  
ঢাকা পড়ে গেল তার একটা বজ্রাঘাতের আওয়াজের তলায়। এবার  
খুব কাছেই পড়ল বাজটা, ভয়ঙ্কর রকম ঝলসে উঠল ঘরের ভেতরটা।  
বরুণ সেন দরজার দিকে পা বাড়াল।

টান পড়ল পেছনে। ফিরে দেখল, তুলসী ছুঁহাতে জামার পিঠটা  
খামচে ধরে আছে।

“ছাড় ছাড়, লোকটা পালাল যে—”

“না না” অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠল তুলসী।

আর কিছুই বলতে পারল না বরুণ, প্রচণ্ড শব্দে একটা জানলার ছ'খানা পাল্লা আছড়ে পড়ল ভেতর দিকে। তুলকালাম কাণ্ড লেগে গেল ঘরের ভেতর। ঝড়ের চোটে বিছানাটা উড়ে এসে পড়ল ওদের গায়ে, আলোটা নিভে গেল। দরজার কপাট ছ'খানা বারবার বন্ধ হোতে লাগল আর খুলতে লাগল। ওরা ছ'জনে প্রাণপণে ছ'জনকে জাপটে ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।

ঐ ভাবে কতক্ষণ কাটল তা' ওরা টেরই পেল না।

এক সময় কমে এল ঝড়ের হুহুংকার। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ গেল বরুণের কানে। তার বন্ধুরা ডাকছে বাবু বাবু বলে।

কোথায় ওরা! কোথা থেকে ডাকছে তাকে!

চোখ মেলে দেখল, ঘরের ভেতর দিকে আলো ফুটে উঠেছে। তখন ছাড়াল হাতের বাঁধন, ছাড়িয়ে এক লাফে দরজার সামনে পৌঁছে কপাট ধরে টানাটানি করতে লাগল।

হাওয়ার ঝাপটায় অনবরত আছাড়ের চোটে কবজা ছিঁড়ে কপাট ছ'খানা তেওড়ে গেছে। খুব জোরে কয়েকটা লাথি দেবার পর একখানা কপাট খানিকটা খুলল। এক রাশ চূণ বালি ইঁটের টুকরো ঢুকে পড়ল ঘরে। তখন বুঝতে পারল যে সাংঘাতিক কাণ্ড কিছু ঘটেছে। খুব সম্ভব দালানটা ধ্বংসে পড়েছে। তখনও শোনা যাচ্ছে নাথলু আর কুঞ্জর ডাক, বাবু বাবু বলে ওরা প্রাণপণে চেষ্টাচ্ছে। কপাটের ফাঁকে মুখ দিয়ে সাড়া দিল—“এই যে—আমি। কি হয়েছে?”

কি যেন জিজ্ঞাসা করল ওরা, ঠিক বুঝতে পারল না।

“না না, কিছুই হয়নি আমাদের। ঘরের ভেতর আটকা পড়েছি। দরজা খুলতে পারছি না।” বলে ওদের নিশ্চিত করল। তারপর ছুটে গেল পেছনের জানলায়। মোটা মোটা চারকোনা গরাদে লাগানো জানলা, গরাদ ওপড়াবার চেষ্টা করা বৃথা। আবার ফিরে গেল দরজার



কাছে। চিৎকার করে বলল—“তোমরা এস দরজার সামনে, ভেঙে ফেল দরজা, নয়ত আমরা বেরুতে পারব না।”

এবার শোনা গেল গোপীনাথের গলা। গড়গড়ি ঠাকুর বলল—  
“আর খানিক আটকা থাকুন ছোটবাবু, কোনও ভয় নেই। একটা থাম ভেঙে পড়েছে, একটা কড়ি ঝুলছে, আমরা ইঁট বালি সরাচ্ছি, এগুলো না সরালে দরজার সামনে যাওয়া যাবে না।”

তখন আর করবে কি! দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বসে পড়ল খালি তক্তাপোশের ধারে। তোশক বালিশ চাদর সব মেঝেয় পড়ে আছে। লগুভগু হোয়ে গেছে সব কিছু। চারিদিকে তাকিয়ে বেশ আরাম বোধ করল। এই রকমই হয়, সমুদ্রের বুকে সাইক্লোন উঠলে জাহাজের অবস্থা প্রায় এই রকমই হয়। মাঝে মধ্যে এই জাতের ঝড় তুফানের ধাক্কা না খেলে বেঁচে থেকে সুখ কোথায়! নিখর নিস্তরঙ্গ প্রাণ-সমুদ্রে জীবন তরণীখানি বহে চলেছে বলে মালুমই হয় না। তাই ঝড় ঝঞ্ঝা ওঠা চাই মাঝে মাঝে, মনে করিয়ে দেওয়া চাই যে বেঁচে আছি। ম্যারীন্ এন্জীনিয়ার বরুণ সেন ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না, বাঁচার মত বাঁচতে হোলে—ঐ তুলসীর মত—

আরামটুকু রয়ে বসে চাখবার অবকাশ মিলল না। নিস্তরঙ্গ ঘরে ঠিক ছ’বার শোনা গেল—“বরুণ বরুণ” অতি অস্বাভাবিক আওয়াজ, আওয়াজটা বহু দূর থেকে ভেসে এল। ওপরের ছাত ফুটো হোয়ে নেমে এল যেন ডাকটা, কিংবা পায়ের তলার মেঝে ভেদ করে উঠে এল। হকচকিয়ে গিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল বরুণ, কোথা থেকে কে বলছে কথাগুলো বুঝতেই পারল না।

আবার সেই জাতের ডাক ঠিক ছ’বার কানে গেল—“বরুণ বরুণ।”

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু পা ফেলে এগিয়ে যাবার সামর্থ্য হোল না। তাকিয়ে রইল ঘরের কোণে। আবছা অন্ধকারে কোণের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। চিনতেই পারল না যেন। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোখ দুটো, একটু বেরিয়ে আছে

জিভটা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে বলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত  
গড়াচ্ছে কশ বেয়ে। নাকের ফোঁড় দুটো ফুলে উঠেছে। অল্প অল্প  
ছলছে সামনে পেছনে, পাছে পড়ে যায় এই জন্য দু হাত বাড়িয়ে  
অদৃশ্য একটা কিছু ধরে আছে যেন দুই মুঠোয়। কিন্তু পড়বে ঠিক,  
তুলনিটা ক্রমেই বাড়ছে।

কয়েকটি কথা শোনা গেল—“শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা ? সাড়া  
দিচ্ছিস না কেন ?”

কোথা থেকে কে বলছে কথাগুলো ? যে জিভ কামড়ে ধরে আছে  
সে কি করে কথা বলবে !

“আমি তোর দাছ, কথা বলছিস না কেন ?”

এইবার সাড়া দিল। বহু কণ্ঠে স্বর বেরুল গলা দিয়ে—“বল,  
শুনতে পাচ্ছি।”

“সেই লামাটা, যাকে তুই গুলি করলি, নিচের রোয়াকে সে চাপা  
পড়েছে রাবিশের তলায়। ঐ ভাবেই থাকুক, ওকে আর কেউ খুঁজে  
পাবে না। ঐ লোকটা এসেছিল তুলসীকে শেষ করতে, যে জিনিষটা  
ফেলে গেছে ঘরে সেটা যদি ছুঁয়ে ফেলিস তোরা, তা’হলে আমি আর  
তোদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। আগে ঐটের একটা ব্যবস্থা  
কর। তাকিয়ে দেখ, দরজার বাঁ পাশে নীল কাপড়ের একটা ছোট  
পুঁটলি পড়ে আছে। কেরোসিন তেল রয়েছে ঠোভে, স্পিরিট রয়েছে  
বোতলে। ঐ সব ঢেলে আগুন ধরিয়ে দে ঐ পুঁটলিটায়। সাবধান,  
ছুঁয়ে ফেলিসনে যেন।”

“ওটার ভেতর কি আছে দাছ ?” পুঁটলিটার পানে তাকিয়ে  
রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল নাতি।

দাছ জবাব দিলেন—“সেজেনে তোর লাভ কি ? যা বলছি তাই  
কর, আলগোছে কেরোসিন ঢেলে আগুন দে। ওধারে ওরা প্রায় সাফ  
করে এনেছে বারান্দা, এখুনি দরজার সামনে পৌঁছবে। আর শোন,  
আমার ঘরের তালা ভাঙবি। বইয়ের আলমারি থেকে বইগুলো



নামালেই রিভলবারের গুলি দেখতে পাবি। ঐ রিভলবারটা আমার, চুরি গিয়েছিল। আর মাত্র তিনটে গুলি ভরা আছে রিভলবারে, ঐ তিনটে খরচ হোলে করবি কি। ঐ অস্ত্রটার গুলি কোথাও মিলবে না। বইয়ের আলমারিতে অনেকগুলো আছে, বার করে নিস। এখন আমি চলে যাচ্ছি—সাবধানে তুলসীকে পাহারা দিবি। সময় মত সব জানাব।”

নিশ্চয় হোয়ে গেল ঘর। বাইরে ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, কাঠ টালি রাবিশ সরানো হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। স্থির হোয়ে দাঁড়িয়েছে তুলসী, আর ছুঁছে না। ওর পানে তাকাবার সময় নেই তখন। ষ্টোভটা তুলে এনে কেরোসিনটুকু ঢেলে দিল সেই পুঁটলিটার ওপর। ওপাশের কুন্ডিতে স্পিরিটের বোতলটা রয়েছে। বোতলটা নিয়ে এসে একটুখানি স্পিরিটও ঢালল। সরিয়ে রেখে দিয়ে এল বোতলটা ওধারের জানলার কাছে। বিছানাপত্রগুলো টেনে তুলল তক্তাপোশের ওপর। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটি কাঠি জ্বালিয়ে ফেলে দিলে পুঁটলিটার পাশে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভয়ানক বিস্ত্রী চামড়া পোড়া গন্ধে দম বন্ধ হোয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ওপাশ থেকে তুলসী অস্পষ্ট চিৎকার করে উঠল। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল ওকে। দরজার সামনে তখন নাথলু চৈঁচাচ্ছে—বাবু বাবু।

ভেঙেছে দালানের ছাত আর থামগুলো, একতলা দোতলার ঘরগুলো সব আস্ত আছে। দোতলার দালানের ছাতটা ভেঙে পড়েছে বলে একতলার ছাতটাও অনেক জায়গায় নষ্ট হোয়েছে, সিঁড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। ঘর থেকে বেরিয়ে অবস্থাটা দেখে হাঁ করে রইল বরুণ, এই স্থপতির রাবিশ এখন সরাবে কে! শতখানেক মানুষ লাগালেও দিন দশেকের আগে সাফ করা যাবে না।

নাথলু কুঞ্জ বিদায় নিল। গাঁয়ের অবস্থা কেমন হোয়েছে জানা দরকার। পাকা বাড়ি যখন ভেঙে পড়েছে তখন একখানা ঘরও বোধ

হয় খাড়া নেই গাঁয়ে। বেশীর ভাগ পুরুষ মানুষ গেছে পাহাড়ে  
লামাদের মালপত্র লুণ্ঠ করতে, এধারে মাগ ছেলেপুলে হয়তো ঘর চাপা  
পড়ে মরে রইল। এরই নাম দৈবের বিড়ম্বনা। সোনাদানা লুণ্ঠে এনে  
পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে সংসার করবে মানুষ, তা'না রাতারাতি  
সব সাক্ষ্য হয়ে গেল। কপালে সুখ না থাকলে এই রকমই হয়।

ওরা ছুটল। গোপীনাথ পাশের ঘর থেকে মল্লিকার মাকে ডেকে  
বার করল। অত্যধিক রকম সজাগ হয়ে তুলসীকে পাহারা দিচ্ছিল  
বলে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত কিছুই টের পায়নি মল্লিকার মা। ঘর থেকে  
বেরিয়েই শোক উথলে উঠল মেয়ে জামাই নাতি নাতনীদের জন্তে।  
সুতরাং কালবিলম্ব না করে সেও ছুটল গাঁয়ে, বংশ লোপ হোল কিনা  
সর্বাত্রে সেই খবরটি নেওয়া চাই।

দরোয়ান ছোটোর খবর নেবার জন্তে গোপীনাথকে গেটে পাঠিয়ে  
ঘরে ঢুকল বরুণ। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে তুলসী, ঐ ভাবেই  
ওকে শুয়িয়ে রেখে গিয়েছিল। কি করে ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে  
তা' জানে না। মল্লিকার মা বলেছিল, গুগ্‌গুলের ধোঁয়া দিতে হয়।  
গুগ্‌গুল এখন পাওয়া যাবে কোথায়! স্মেলিং সন্ট্ যদি পাওয়া যেত।  
কিন্তু বেহুঁশ তো হয়নি ঠিক, কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব, একটা  
অদৃশ্য শক্তি যেন অধিকার করে রয়েছে চৈতন্য। কতকটা হিষ্টিরিয়ার  
মত ব্যাপার, হুঁশ জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু নিজেকে চালাবার ক্ষমতা  
নেই। কামড়ে ধরেছিল-জিভটা, কেটে রক্ত গড়াচ্ছিল, বুঝতেও  
পারছিল না। আহা বেচারী!

লাগল ছোবল, কালনাগিনী সহানুভূতি মারলে ছোবল বুকের  
ভেতর, কালবিষ দরদে মন বুদ্ধি কাল হয়ে গেল। একটি কালনিঃশ্বাস  
উঠে এল বুকের ভেতর থেকে, টনটন করে উঠল শরীরের প্রতিটি শিরা  
উপশিরা। বসে পড়ল বরুণ সেন তুলসীর পাশে। আর একবার  
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল যে পালাবে ওকে নিয়ে। সেই দিনই  
পালাবে। একটিবার হুঁশ ফিরলে হয় তারপর আর এক মুহূর্ত ঐ



বাড়িতে থাকবে না। ছনিয়াটা কত বড় তা' জানে বরুণ সেন। এই বিপুল ধরিত্রীর কোনও একটা নির্জন দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে হু'জনে। কোনও দিন কেউ টের পাবে না জ্ঞানপ্রকাশ সেনের নাতিটি কোথায় গেল।

স্বয়ং জ্ঞানপ্রকাশ পর্যন্ত—

সেটা কি সম্ভব! মানে—ভূত তো; দাছ তো ভূত হয়েছে। ভূত যদি পেছু নেয়!

কি করছে বুঝতেও পারল না, তুলসীকে ধরে সজোরে নাড়া দিতে লাগল—“শুনছ, শুনছ—”

গুগ্গলের ধোঁয়া স্মেলিং সণ্ট্‌ কিছুই লাগল না, মুখের চাদর সরিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তুলসী।

“কি! কি হয়েছে?” তুলসীর গলাতেও আতঙ্ক ফুটে উঠল।

“মানে—আমরা পালিয়ে যাব—” ফিসফিস করে বলতে লাগল বরুণ ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে—“কিন্তু দাছ জানতে পারবে না তো? দাছ যদি পেছু নেয়! তুমি তো জান—মানে—ওঁরা তো এখন হাওয়ার মত কিনা, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন। আমরা টেরও পাব না, দাছ ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাবে।”

আটকানো দমটা ফেলে তুলসী বলল—“এইবার একটু ঘুমিয়ে নিন আপনি, চোখে মুখে জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়ুন। খানিকক্ষণ না ঘুমলে আপনার—”

“ঘুম!” ঐ ছোট্ট কথাটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নুয়ে পড়ল বরুণ সেনের। আর একবার ঐ কথাটাই উচ্চারণ করল ভয়ানক বাঁকা স্বরে—“ঘুম।” তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল তুলসীকে—“কি করে ঘুমবো আমি? ঘুম ঘুচে গেছে জন্মের মত। ঘুমিয়ে পড়লে যদি মুখ দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে পড়ে! যদি সব জানাজানি হয়ে যায়! যদি—”

“কি! কি বেরিয়ে পড়বে মুখ দিয়ে?”

“যা বলেছ তুমি, মানে—তোমার মুখ দিয়ে দাছ যা শুনিয়েছে আমাকে।”

“কি বলেছি আমি! কি আপনি শুনেছেন।”

“মনে পড়ছে না তোমার?”

“কিছুই মনে পড়ছে না। আপনি বিশ্বাস করুন বরুণবাবু, দয়া করে বিশ্বাস করুন আমাকে। ইচ্ছে করে কিছুই বলিনি আমি, এমন কি আমি মোটে জানতেই পারি না আমার মুখ থেকে কি বের হয়।”

“তা’হলে ঠিক আছে।” এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বরুণ। এতক্ষণ পরে ফিরে পেল যেন নিজেকে। মাথা নেড়ে স্বাভাবিক সুরে সহজ ভাবে বলল—“খুব বেঁচে গেছ তা’হলে তুমি। তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য তোমাকেই হয়তো শেষ করে ফেলতে হোত আমাকে। আমারও যেন মনে হচ্ছে, যা তুমি বল তা নিজে জানতে পার না। অথ কোনও শক্তি তোমার মুখ দিয়ে ঐ সমস্ত শোনাতে আমাকে। ঠিক আছে। পালাব তোমাকে নিয়ে। এমন জায়গায় পালাব যে—” বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল ভয়ানক সম্ভ্রান্ত ভাবে। যেন কেউ শুনে নিচ্ছে ওর কথাগুলো, যে শুনেছে সে যেন অদৃশ্য অবস্থায় ঘরের ভেতরেই হাওয়ায় মিশে আছে।

এইবার হাল ধরল তুলসী, নারী এইবার সুযোগ পেল হাল ধরে ডুবন্ত তরলীখানিকে সামলাবার। বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত পুরুষকে নারী যা দিতে পারে সে জিনিষ সাহসও নয় শক্তি নয়, পরামর্শ তো নয়ই। বিজ্ঞজনে বলে গেছেন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। সুতরাং এমন বোকা কে আছে যে নারীর কাছ থেকে মতলব নিতে যাবে! তবু নারী যা দেয়, এ পর্যন্ত পুরুষ যে বস্তু পেয়েছে নারীর কাছ থেকে, পেয়ে মরিয়া হোয়ে লড়াই করেছে জীবনের সঙ্গে, লড়াই ফতে করে পরাজিত জীবনকে হেলায় তুলে দিয়েছে নারীর হাতে, সেই বস্তুটির নাম আশা।



৫

আবার আমি দাঁড়াতে পারব, আবার লড়তে পারব, বড় ঝঞ্ঝা বজ্র  
বিদ্যুৎ হচ্ছে ক্ষণিকের অতিথি, এরা বিদায় হোলে সাক্ষাৎ পাব নব-  
দিগন্তের। এই আশাগুলিকে নারীই জাগাতে পারে বুকে। ঐ ক্ষীণকায়া  
নারী, সদাসর্বক্ষণ যাকে আগলে রাখতে হয়, পুরুষের কাছে যে একটা  
অনর্থক বোঝা ছাড়া কিছুই নয়, সেই নারী প্রয়োজনের সঠিক  
মুহূর্তটিতে প্রকাশ করে নিজের মহিমা, মা বোন প্রিয়া যে কোনও  
রূপেই হোক পাশে এসে দাঁড়ায়। যুক্তি তর্ক ওজস্বিনী বক্তৃতা কোনও  
কিছুই দরকার হয় না, নারীত্বের সঞ্জীবনী সুধার এমনই গুণ  
যে পুরুষ আবার উঠে দাঁড়ায়। ছনিয়ার বুকে পা ঠুকে বলে—আচ্ছা  
দেখা যাবে।

নারী যখন ঐ শক্তিটি খোঁায়, পুরুষের বুকে আশা জাগাতে পারে  
না, তখন সে বন্ধা। বন্ধা নারী সত্যিই পথে বিবর্জিত। কার দায়  
পড়েছে অনর্থক তার ভার বইবে।

বরুণ সেন তার ভয়ঙ্কর কড়া পুরুষটাকে বিনা দ্বিধায় তুলে দিল  
তুলসীর হাতে। মোটে টেরই পেল না বেচারি যে তুলসী তার ভার  
গ্রহণ করলে। উঠে পড়ল তুলসী, কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে গেল  
কাজে। টুথপেষ্ট আর ব্রাস খুঁজে বার করলে, ঘর থেকে বেরিয়ে  
গিয়ে জল নিয়ে এল এক বালতি। তারপর ষ্টোভ জ্বলে চায়ের জল  
চাপাল।

ছ'হাতে মাথার ছ'পাশ চেপে ধরে পাথরের মত বসে ছিল বরুণ,  
বিনা বাক্যব্যয়ে ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে গেল তুলসী। এক কোণে  
ঘর থেকে জল বেরুবার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে পেষ্ট লাগানো টুথব্রাস  
হাতে দিল। জলের বালতিটাও আনল সেখানে। ঘটি নেই ঘরে,  
একটা সোরাইয়ের মাথায় কাঁচের গেলাস চাপা ছিল। গেলাস সোরাই  
ছ'টোই ভেঙেছে। অগত্যা চায়ের কাপে করে জল তুলে ওর হাতে  
ঢালতে লাগল। মুখ ধোওয়া হোল, মাথায় মুখে জল দেওয়া হোল,  
শান্ত ছেলের মত ফিরে এসে বসল বরুণ বিছানায়। তখন চা তৈরী

করতে বসল তুলসী।

দরজার বাইরে সাড়া পাওয়া গেল গোপীনাথের। উঠে গিয়ে  
কি যেন বলে এল তাকে তুলসী। তারপর এক কাপ চা নিয়ে এসে  
ওর সামনে দাঁড়াল।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাপটা নিল বরুণ, মাথা হেঁট করে  
ভয়ানক অশ্রুমনস্ক ভাবে কাপে চুমুক দিতে লাগল।

তুলসী বলল—“চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন, শুলেই ঘুমোতে পারবেন।”

গোঁ গোঁ করে কি যেন বলল বরুণ। তুলসী বলল—“ঠিক আছে,  
ঠিক আছে, আগে আপনি ঘুমিয়ে নিন না খানিকটা। আমি তো  
জেগে রইলাম, আমি পাহাড়া দোব, যতক্ষণ না আপনার ঘুম ভাঙবে  
কেউ এ ঘরে আসতে পারবে না।”

অতএব ঘুম। খালি কাপটা ওর হাতে দিয়ে শুয়ে পড়ল বরুণ।  
চাদরটা চাপা দিয়ে দিল তুলসী। তারপর ওধারে গিয়ে জানলা  
ছোটো টেনে বন্ধ করে দিল, অন্ধকার দরকার। বাইরে তখন রোদ  
উঠে পড়েছে। দুর্যোগ শেষ, আলোর ভাষায় তিমিরভঞ্জন অভয়-  
বাণী শোনাচ্ছেন।



যুমন্ত বরুণ সেনের পাশে বসে রইল তুলসী। নিজের মগজটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করতে লাগল—“কি বলেছি আমি। কি বলেছি? কি বলেছি?”

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—কে কি শুনিয়েছে বরুণ সেনকে ওর মুখ দিয়ে? কোন উপায় নেই কিছু জানবার, মন-মগজ সমস্ত সাফ পরিস্কার। কোনও কিছু স্বপ্ন দেখেছিল কি! না, তাও নয়, একদম ফাঁকা, একেবারে শূন্য, ধরণী করারও উপায় নেই যে বেহুঁশ অবস্থায় কি করেছিল কি বলেছিল। অসহ্য অসহায় অবস্থা! সেই সময়, যখন হুঁশ জ্ঞান থাকে না, তখন কাপড় চোপড় ঠিক থাকে কি না তাই বা কে জানে! সেই পাগলটার মত, গায়ে এক চিলতে ত্বাকড়া পর্যন্ত নেই, লজ্জা শরম ঘেন্না ভয় কিছু নেই, যা মুখে আসছে বলছে, যে কামনা বাসনাগুলোকে অতি সাবধানে চাপা দিয়ে রাখতে হয় বুকের মধ্যে সেগুলোও ছড়ছড় করে বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে, ছিটেফোঁটা শক্তি নেই নিজেকে সামলাবার। সেই জন্তুটার মত হোয়ে পড়ে সে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা!

কি করেছে সে বেহুঁশ অবস্থায়! এই বরুণ সেন তার শরীরের কতটা অংশ দেখতে পেয়েছে! কি বেরিয়েছে মুখ দিয়ে! কতটা কি জানতে পেরেছে এই লোকটা!

মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও, ভগবান বলতে সত্যিই যদি কেউ থাক তা’হলে আমাকে মৃত্যু দাও।

কায়মনোবাক্যে মৃত্যু কামনা করতে লাগল তুলসী। অনেকক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে রইল। হাতের আঙ্গুলগুলোকে প্রাণপণে মোচড়াতে লাগল। তারপর হাঁপাতে শুরু করলে। হাঁপাতে হাঁপাতে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে কি ভাবে কি রকম করে ঐ অবস্থাটা হয় তার।

প্রথমে ঘুম পেয়ে যায় ভয়ানক রকম, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই শুরু করে ঘুমকে তাড়াবার জন্তে। সেই লড়ালড়ি চলতে চলতেই হঠাৎ এক সময় বুঝতে পারে যে হাওয়ায় ভাসছে। মাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই থাকে না, ভয়ঙ্কর রকম হালকা মনে হয় নিজেকে। একটা কিছু খামচে ধরবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে। কি ধরবে, কিছু নেই, কোনও কিছু অবলম্বন নেই কোথাও। তখন ডুবতে থাকে, অনাদি অনন্ত অন্ধকারের গর্ভে একটু একটু করে তলিয়ে যায়।

তারপর এক সময় মনে হয়, সমস্ত শরীরটাকে কে যেন গামছা নিঙ্ড়াবার মত করে নিঙ্ড়াচ্ছে। যন্ত্রণার চোটে বিকট চিৎকার করে ওঠে। গলা বন্ধ, এতটুকু আওয়াজ বেরুবার উপায় নেই। বুকের ভেতরে তোলপাড় লেগে যায়। আর শরীরটা যেন আটকে থাকে মাটির সঙ্গে, জগদল পাথরের মত ভারী শরীর, হাত পা নাড়বার সামর্থ্যটুকুও নেই তখন, হাঁ করে খাবি খেতে থাকে।

ঐ খাবি খেতে খেতেই মনে পড়ে যায় সব। কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, সমস্ত খেয়াল হয় তখন। আর—

আর তখন মৃত্যু কামনা করতে থাকে কায়মনোবাক্যে—হে ভগবান, সত্যিই যদি তুমি থাক, তা'হলে মরণ দাও, মরণ দাও, মরণ দাও। এ ভাবে বেইজ্জৎ হোয়ে বেঁচে থাকতে পারব না আমি, পারব না।

কাঁদতে লাগল তুলসী, এতটুকু শব্দ হোল না, এক ফোঁটা জল পড়ল না চোখ দিয়ে। কাঁদতে লাগল, কিন্তু সত্যিকারের কান্না চোখের জল ঝরাতে পারে না, বুকের ভেতর অতি সঙ্কোপনে রক্ত ঝরায়। বলির পশু, রক্ত ঝরবেই।



বলি।

শচী তার নাম দিয়েছিল—বলি। একদম কথা বলত না শচী, প্রাণপণে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল—“কেন এলে এখানে?”

তুলসী জবাব দিয়েছিল—“চাকরি করতে। কেন এসেছি তা’ আপনি জানেন না নাকি?”

“চাকরি করতে এসেছ? কি চাকরি?” নিতান্ত ভাল মানুষের মত জানতে চেয়েছিল শচী, তুলসী জবাব দিতে পারে নি! সত্যিই সে ভেবে পাচ্ছিল না, কেন তাকে চাকরি দেওয়া হোল। জ্ঞানপ্রকাশ হুকুম দিয়েছেন—“খাও দাও আর বাড়িটার ওপর নজর রাখ। যা চাকরগুলো ফাঁকি দিচ্ছে কিনা দেখবে।” একটা টাইপরাইটার দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—“ঐটে নিয়ে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করবে, তা’হলেই হাত এসে যাবে। কখনও হয়তো ছ’ চারখানা চিঠিপত্র ছাপলে, সবই জেনে রাখা ভাল।” কোনও কাজ নেই, চাকরির প্রথম দুটো মাস খেয়ে আর ঘুমিয়েই কেটে গিয়েছিল। ঐ সময় একবার শচীনন্দন মুখ খুলে জানতে চেয়েছিল, কি কাজ করতে এসেছে সে। তুলসী জবাব দিতে পারে নি।

জবাবটি শচীই দিয়েছিল। ওর সেই অদ্ভুত ঘোলাটে দৃষ্টিতে তুলসীর মুখ পানে সোজাসুজি তাকিয়ে বলেছিল—“বলি, তুমি হোলে দ্বিতীয় বলি। শুভ দিনে শুভক্ষণে তোমাকেও উৎসর্গ করা হবে।”

সেই থেকে যখনই ডাকবার দরকার পড়েছে, বলি বলে ডেকেছে ওকে শচীনন্দন। অবশ্য খুবই কম বার ওকে ডেকেছে শচীনন্দন, সব স্ত্রদ্ধ ছ’ তিন বারের বেশী নয়। কথাই বলত না সে, কারও সঙ্গেই কথা বলত না। এমন কি জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গেও নয়। যা হুকুম দিতেন মনিব, মুখ টিপে শুনে নিত। তারপর হুকুম মারফি কর্মগুলি সম্পন্ন হোয়ে যেত। দরোয়ানরা চাকররা মায় গোপীনাথ পর্যন্ত ভয় পেত শচীনন্দনের সামনে যেতে। অথচ কোনও দিন একটি বারের

জন্তোও শচী ওদের ধমকায় নি। ধমকানো দূরের কথা, চৈঁচিয়ে কথাই বলত না। সদাসর্বক্ষণ ফিসফিস, এক গেলাস জল চাইতে হোলেও ফিসফিস করে চাইবে। যার কাছে চাইবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে—“এক গেলাস জল দিতে পার নাকি?” ফিসফিস করে কথা বলতে হোলে গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই হবে।

লোকটাকে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল তুলসীর। একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল—“ও ভাবে ফিসফিস করে কথা বলেন কেন আপনি?”

শচীনন্দন গলাকে আরও খানিক খাদে নামিয়ে পালটা প্রশ্ন করেছিল—“তুমিই বা চৈঁচিয়ে কথা বল কেন? মনে মনে কথা বলতে পার না?”

“মনে মনে কথা বলা! সে আবার কি!” হতভম্ব হয়ে পড়েছিল তুলসী।

নিঃশব্দে বিচিত্র হাসি হেসে রহস্যময় জবাব দিয়েছিল শচী—“বুঝবে, সবই বুঝতে পারবে সময় হোলে। বলি তুমি, আগে বলি হোয়ে যাক তারপর বুঝবে।”

“কি সব আজ্ঞে বাজ্ঞে কথা বলেন?” ধমকে উঠেছিল তুলসী। লোকটিকে একটু সমঝে দেবার জন্তো কড়া সুরে গুনিয়ে দিয়েছিল—“ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে? মনে করেছেন, আপনার কথা শুনে ভয় পেয়ে আমি চলে যাব—না?”

খুবই অমায়িক ভাবে জবাব দিয়েছিল শচী—“পারলে তো। এখানে আসার পথটা সোজা, যাবার পথটা ভয়ঙ্কর রকম জটিল। পারলে তো পালাবে।”

তুলসী আর কথা বলেনি। কিন্তু সত্যিই রোজ রাতে গা ছমছম করত তার নিজের ঘরে শুয়ে। প্রকাণ্ড বাড়িটায় মাত্র চার পাঁচটি প্রাণী, দোতলায়—স্বয়ং কর্তা নিজের ঘরে শুয়ে আছেন, একজন চাকর—বান্ধু কিংবা শিবু বসে আছে দালানে, একটা কমানো আলো রয়েছে



তার হাতের কাছে, কোনও দিন যদি মনিব ডাকেন তা'হলে আলোটা বাড়িয়ে হুকুম তামিল করতে যাবে। নিচের তলায় একটা ঘরে শচী, আর একটা ঘরে তুলসী, গোপীনাথ একজন চাকরকে নিয়ে রান্না বাড়িতে গুত। নিরব নিঝুম যমপুরী, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত তুলসীর। জানলা দরজা বন্ধ করে আলো জালিয়ে রেখে গুত সে, মশারির ভেতর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত আলোটার পানে, কিছুতেই ঘুম আসত না। নানা জাতের শব্দ গুনত, একটা পেঁচা ডেকে উঠল প্রাণপণে দালানের ভেতর, অনেক দূরে বাগান থেকে সাড়া দিলে শেয়ালরা, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছপ্-ছপ্-করে কে যেন ছুটতে শুরু করে দিলে বারান্দায়, স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল পায়ের আওয়াজ। সেটা মিলিয়ে গেল তো শোন তখন নাকী সুরে কান্না, কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। কান্নার মাঝখানেই লেগে গেল তুমুল ঝগড়া, দুই হলো তর্জন গর্জন জুড়লে। মিনিট পনেরো তর্জন গর্জন চালিয়ে লড়ে গেল হুলোরা, ছটোপাটি করতে করতে উধাও হোল। আবার সব নিস্তব্ধ, একমাত্র মশার গুনগুন ছাড়া আর কিছুই শোনার নেই। কান খাড়া করে জেগে গুয়ে থাকত তুলসী, তাকিয়ে থাকত জ্বলন্ত আলোটার পানে, রাত ফুরিয়ে আসত। ঐ বাড়িতে রোজ রাতে কত রকমের শব্দ হয়, কোন আওয়াজটা কখন হয়, সব তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নতুন জাতের কোনও শব্দ কানে গেলেই গা ছমছম করত। তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত, পালাবে। চেষ্টা করলে আর একটা চাকরি জুটে যাবে নিশ্চয়ই, যত দিন না জোটে ছেলে মেয়ে পড়াবে। দরকার নেই এত সুখে, পালাবে সে, নিশ্চয়ই পালাবে।

ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম থেকে উঠত বেলায়, পালাবার কথাটা সারা দিনে উঁকিও মারত না মনের কোণে। বাড়ি বাগান নির্জনতা অথগু অবকাশ সহ অবাধ স্বাধীনতা, মাস গেলে একশ' পঞ্চাশ টাকা নগদ মিলছে, এত সুখ কোথায় পাওয়া যাবে। শচীনন্দনের

তার হাতের কাছে, কোনও দিন যদি মনিব ডাকেন তা'হলে আলোটা বাড়িয়ে ছুকুম তামিল করতে যাবে। নিচের তলায় একটা ঘরে শচী, আর একটা ঘরে তুলসী, গোপীনাথ একজন চাকরকে নিয়ে রান্না বাড়িতে গুত। নিরব নিঝুম যমপুরী, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত তুলসীর। জানলা দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে রেখে গুত সে, মশারির ভেতর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত আলোটার পানে, কিছুতেই ঘুম আসত না। নানা জাতের শব্দ শুনত, একটা পেঁচা ডেকে উঠল প্রাণপণে দালানের ভেতর, অনেক দূরে বাগান থেকে সাড়া দিলে শেয়ালরা, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছপ্-ছপ্ করে কে যেন ছুটতে শুরু করে দিলে বারান্দায়, স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল পায়ের আওয়াজ। সেটা মিলিয়ে গেল তো শোন তখন নাকী সুরে কান্না, কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। কান্নার মাঝখানেই লেগে গেল তুমুল ঝগড়া, দুই হলো তর্জন গর্জন জুড়লে। মিনিট পনেরো তর্জন গর্জন চালিয়ে লড়ে গেল হলেরা, ছটোপাটি করতে করতে উধাও হোল। আবার সব নিস্তব্ধ, একমাত্র মশার গুনগুন ছাড়া আর কিছুই শোনার নেই। কান খাড়া করে জেগে শুয়ে থাকত তুলসী, তাকিয়ে থাকত জ্বলন্ত আলোটার পানে, রাত ফুরিয়ে আসত। ঐ বাড়িতে রোজ রাতে কত রকমের শব্দ হয়, কোন আওয়াজটা কখন হয়, সব তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নতুন জাতের কোনও শব্দ কানে গেলেই গা ছমছম করত। তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত, পালাবে। চেষ্টা করলে আর একটা চাকরি জুটে যাবে নিশ্চয়ই, যত দিন না জোটে ছেলে মেয়ে পড়াবে। দরকার নেই এত সুখে, পালাবে সে, নিশ্চয়ই পালাবে।

ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম থেকে উঠত বেলায়, পালাবার কথাটা সারা দিনে উঁকিও মারত না মনের কোণে। বাড়ি বাগান নির্জনতা অথও অবকাশ সহ অবাধ স্বাধীনতা, মাস গেলে একশ' পঞ্চাশ টাকা নগদ মিলছে, এত সুখ কোথায় পাওয়া যাবে। শচীনন্দনের



কথাটা ফলল, ঐ চাকরি ছেড়ে পালানোটা সম্ভব হোল না।  
ওখান থেকে ফিরে যাবার পথটা যে কি ভয়ঙ্কর জটিল আরও কিছু  
দিন পরে তা বুঝতে পারল।

সাইকেল চালানোটা রপ্ত হোয়ে গেছে তখন। সকাল বিকেল  
সাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়ে, ফটকের সামনের পথ দিয়ে এধারে  
অনেক দূর চলে যায়। পথে গরু ছাগল মোষ ছাড়া মানুষের সঙ্গে  
বড় একটা দেখা হয় না। যারা গরু মোষ চরায় তাদের সঙ্গে আলাপ  
পরিচয় করার উপায় নেই। মেয়েমানুষ সাইকেল চেপে সাঁ সাঁ করে  
ছুটছে, এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে তারা মাঠে নেমে পড়ে। মাঝে মাঝে  
মোষ গরুগুলোও হকচকিয়ে গিয়ে লেজ তুলে দৌড়ায়।

ঘটল একদিন এক বিপর্যয় কাণ্ড। একটা বাঁকের মাথায় শিঙে  
শিঙে জড়াজড়ি করে দুটো মোষ ঠেলাঠেলি করছিল। বাঁক ঘুরেই  
তুলসী একেবারে তাদের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। প্রাণপণ চেষ্টায়  
পাশ কাটাল তাদের, কোনও রকমে টাল সামলেই বুঝতে পারল যে  
আর রক্ষে নেই। লড়াই মূলতবী রেখে একটা মোষ সাইকেলের  
পেছনে ধাওয়া করেছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে পা চালাতে  
লাগল, মোষটাও গাঁক গাঁক করে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটল। ছ'পাশের  
মাঠে বারা কাজ করছিল, রৈ রৈ করে তারা মোষটাকে উৎসাহ দিতে  
লাগল। মোষের সঙ্গে সাইকেলের দৌড় প্রতিযোগিতা, সাইকেল  
চালাচ্ছে আবার একটা মেয়েমানুষ, এমন মজাদার ব্যাপার আকছার  
ঘটে না। তাই দর্শকদের পক্ষে উত্তেজিত হোয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়াত কে জানে। হঠাৎ পথের  
মাঝখানে উদয় হোলেন একজন। দূর থেকে তুলসী দেখতে পেল,  
রঙ করা আলখাল্লা পরা কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক মুহূর্তের  
মধ্যে পৌঁছে গেল তাঁর সামনে, তাঁকেও পাশ কাটাবার চেষ্টা করল।  
সম্ভব হোল না, চাকা দুটো পথের ওপর গেড়ে বসে গেল যেন। টলে

পড়ল একপাশে। পেছন ফিরে দেখল, কোথায় সেই যম! কোথাও নেই, অতবড় মোষটা উধাও, একদম বেমানুম অন্তর্ধান করেছে।

ভয়ানক ভেবাচাকা খেয়ে তাকাল সামনে। কমলা রঙের আল-খাল্লা পরা নেড়া মাথা অদ্ভুতদর্শন একটা বুড়ো তার মুখ পানে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে।

সেই শুরু। শুরু হোয়ে গেল ভেলকিবাজি তুলসীর জীবনে। বুড়ো লামাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল তুলসী সেদিন। জ্ঞানপ্রকাশ সেন মহা খুশী হোয়ে পড়লেন। কারণ লামাটি তাঁর সাক্ষাৎ গুরুদেব। করুণাময় গুরু ঠিক সময় ঠিক স্থানটিতে আবির্ভূত হোয়ে সাক্ষাৎ যমের গ্রাস থেকে তুলসীকে রক্ষা করেছেন। অতএব তুলসীর মত ভাগ্যবতী মেয়ে আর কে আছে।

সিঁড়ির নিচে সেই বেঁটে দরজাটা খোলা হোল। জ্ঞানপ্রকাশ সেনের গুরুদেব সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে ঘাড় হেঁট করে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ হোয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগে শচীনন্দনের সামনা সামনি পড়ে গেল তুলসী। পথ আগলে দাঁড়িয়ে শচীনন্দন ফিসফিস করে বলল—“বলি বলি, মহাসৌভাগ্যবতী তুমি, বলিদানের শুভ মুহূর্তটি এত তাড়াতাড়ি—”

বাকীটা শুনল না তুলসী, ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল তুলসীর। ঘুম ভাঙবার পর টের পেল যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। জ্বলন্ত আলোটার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আলোটা কোথায়। নিভে গেল নাকি!

আলোর বদলে দেখতে পেল সেই বুড়োকে। অন্ধকারের ভেতর স্পষ্ট দেখতে পেল নেড়া মাথাটা, নেড়া মাথাটার ভেতর থেকে যেন আলো বেরুচ্ছে। দেখতে পেল চোখ দুটো, টানা টানা লম্বা চোখ দুটো নীল আলোর তৈরী। সেই নীল আলোর পানে নজর পড়বার



পর আর নজর ফেরাতে পারল না। ভয়ানক ঘুম পেতে লাগল। সেই চেষ্টাটা যখন চলছে তখন হঠাৎ খেয়াল হোল যে ভয়ানক হালকা হোয়ে পড়েছে। বিছানার ওপর বসে নেই সে, হাওয়ায় ভাসছে। একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার জন্যে আঁকুপাঁকু করে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর ডুবতে শুরু করলে, তলিয়ে গেল অনন্ত অন্ধকারের তলায়। তলিয়ে গেল।

তুলসীর জীবনে এই ভাবেই তলিয়ে যাওয়াটা শুরু হোয়েছিল।

তলিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা পেয়ে বসল যেন। হঠাৎ মনে হোল, আবার বুঝি সত্যিই তলিয়ে যাচ্ছে। কি করছে বুঝতেও পারল না, ঘুমন্ত বরুণকে ছ'হাতে ধরে সজোরে নাড়া দিতে লাগল। ঠিক এই ভাবে বরুণও তাকে জাগিয়েছিল। সে কিন্তু তখন ঘুমচ্ছিল না, আপাদমস্তক চাদর চাপা দিয়ে পড়েছিল। বরুণ বেচারা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমন্ত মানুষ চিৎকার করে উঠল আঁ আঁ করে, পরমুহূর্তেই উঠে বসে তুলসীর হাত ছ'খানা চেপে ধরলে।

তুলসী বলল—“ঝাঁকুনি দাও, ঝাঁকুনি দাও আমাকে, আবার আমার সেই রকম—”

আর বলতে হোল না। ওর চোখ দুটোর পানে তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারল বরুণ। সঙ্গে সঙ্গে ওর ছ'কাঁধ খামচে ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি খাবার পর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল তুলসীর। খুব জোর একটা শ্বাস ফেলে বলল—“ছাড়, লাগছে।” ছেড়ে দিল বরুণ, বিছানার ওপর থেকে নেমে পড়ল এক লাফে। নেমেই তুলসীর একখানা হাত ধরে টান দিল। তুলসীও নেমে দাঁড়াল টানের চোটে।

বরুণ বলল—“চল চল, শিগ'গির চল পালাই এখান থেকে।”

অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করল তুলসী—“কোথায়?”

জবাব নেই, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তুলসীর মুখ পানে

বরুণ সেন, কোথায় পালাতে হবে সেটা বলতে পারল না। হাতটা  
কিন্তু ছেড়ে দিলে না, ধরেই রইল।

ছ'জনে ছ'জনের মুখের পানে তাকিয়ে একই ভাবনা ভাবতে লাগল  
—কোথায় পালানো যায় !

অবশেষে তুলসীই পথ দেখাল। বলল—“চলুন, বাগানে গিয়ে  
বসি। দশটা এগারটা বেজে গেছে বোধ হয়। অর্ধেকটা বাড়ি ভেঙে  
গেছে। আজও যদি ঝড় ঝুটি হয় তা'হলে বাকীটুকুও ভাঙবে।  
চলুন, ঘুরে দেখা যাক অবস্থাটা। মনে হচ্ছে, আমাদের পালাতেই  
হবে এখান থেকে। এই ভাঙা বাড়িতে থাকলে বাড়ি চাপা পড়ে মরে  
থাকব।”

বাড়িটা ভেঙেছে মনে পড়তেই বোলআনা ছ'শ ফিরে পেল  
বরুণ। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে চাদরখানা তুলে নিয়ে গায়ে  
জড়াতে জড়াতে বলল—“দেখে আর কি লাভ হবে। আর একটা রাত  
কিছুতেই থাকব না আমরা এখানে। বাবার কাছে একটা তার করে  
দিচ্ছি। গোপীনাথ রইল দরোয়ানরা রইল, ওরাই পাহারা দিক ভাঙা  
বাড়ি। আমরা চললাম।”

আর একবার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল তুলসী যে, কোথায় যাওয়া  
হবে। খুব সামলে গেল।

নামল নিচে, ছ'জনে। দালানে বা বারান্দায় পা দেবার জায়গা  
নেই। সম্পূর্ণ ছাতখানা ভেঙে পড়েনি বটে, কড়ি বরগাগুলো কিন্তু  
প্রায় সবই খসে গেছে। মোটা থামও কয়েকটা নেই। ইঁট চূণ বালি  
শুকি ডাঁই হোয়ে রয়েছে। সিঁড়ির দরজা পার হোয়ে উঠল ছ'জনে  
সেই রাবিশের পাহাড়ে, এগিয়ে চলল। ওপর দিকে তাকিয়ে তুলসীর  
বুক কেঁপে উঠল, কড়ি বরগা হীন ছাতখানা শূন্যে ঝুলছে। যে কোনও  
মুহুর্তে মাথার ওপর নেমে পড়তে পারে।

তাড়া দিল বরুণকে—“চলুন চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন। দেখছেন



না ছাতের অবস্থা।”

কে দেখবে! পায়ের নিচে রাবিশগুলোর পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে  
স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বরুণ, ওর কথাটা যেন শুনতেই  
পেল না।

পেছন থেকে আবার বলে উঠল তুলসী—“চলুন চলুন, দাঁড়ালেন  
কেন?”

পিছিয়ে এল বরুণ, ওর দিকে ফিরে বলল—“এধার দিয়ে তো  
যাওয়া যাবে না।”

“কেন যাবে না? চলুন না এগিয়ে, এগুলো ডিঙিয়ে রকে গিয়ে  
নামলেই আর ভয় নেই।” বলতে বলতে পা বাড়াল তুলসী।

“না না” অঁতকে উঠল বরুণ। ছ’হাত মেলে তুলসীর পথ আগলে  
বলল—“ফের ফের, কিছুতেই যাওয়া যাবে না এধার দিয়ে। এই  
রাবিশগুলোর তলায়—” থেমে গেল বলতে বলতে। তীব্র দৃষ্টিতে  
তুলসীর চোখের পানে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

তুলসীও ভয় পেয়ে গেল—“কি আছে রাবিশের তলায়?” চাপা  
গলায় জানতে চাইল।

“ভুলে গেলে!” আশ্চর্য হয়ে পড়ল বরুণ। পরমুহূর্তে খেয়াল  
হোল যে দাছ যা বলেন তা ও জানতে পারে না। তাড়াতাড়ি চাপা  
দিতে গেল ব্যাপারটা, ধনকে উঠল—“তর্ক করবেনাকি এখানে দাঁড়িয়ে?  
দেখছ না ঝুলে রয়েছে ছাতটা। চল ওধারে সিঁড়ির তলায়।”

ফিরল তুলসী, সিঁড়ির তলায় সেই ছোট দরজাটার সামনে গিয়ে  
দাঁড়াল ছ’জনে। দরজায় তালা লাগানো নেই দেখে বরুণ বলল—  
“এ কি ব্যাপার! আমি তো তালা দিয়ে গিয়েছিলাম! খুললে কে  
তালা!”

এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিল তুলসী দরজায়। মুখ ফিরিয়ে বলল—  
“ভেতর থেকে বন্ধ দেখছি, কে ঢুকেছে ঘরে!”

বরুণ ক্রোড়ে উঠল, দমাদম লাথি মারতে লাগল দরজার গায়ে।

প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে বলল—“এখনও তিনটে গুলি রয়েছে তোমার রিভলবারে, এগুলোও খরচ করতে হবে দেখছি। ওপাশের দরজা খুলে না পালালে হয়।”

তুলসী বলল—“সে উপায় নেই, আমি আর মল্লিকার মা যখন যাই তখন ও পাশের দরজায় চাবি দিয়ে গেছি।”

দরজার পেছনে একটু শব্দ হোল যেন, মনে হোল ছিটকিনি নামাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। লাথি মারা বন্ধ করে পিছিয়ে দাঁড়াল বরুণ, বাঁ হাত দিয়ে তুলসীকেও টেনে নিল। ডান হাতখানা প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো আছে।

আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক হোল। সেই ফাঁক দিয়ে হেঁট হয়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষ। হাঁ, মানুষই বেরিয়ে এল। এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে, ঘাড়টা সোজা করে মুখটা কিন্তু তুলতে পারল না।

একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল বরুণের মুখ দিয়ে। তুলসী চৈঁচিয়ে উঠল—“শচীবাবু—আপনি!”

কাঠের পুতুলের মত টলতে টলতে এগিয়ে এল শচীনন্দন। ছ’হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে গেল, পারল না। কাটা গাছের মত টলে পড়ল সামনে, ছ’হাত বাড়িয়ে বরুণ ধরে ফেলল তাকে।

কোথায় গিয়েছিল শচী, এলই বা কোথা থেকে, কখন এসে কি করে ঢুকল ঘরে, অগুণতি প্রশ্ন গুলো তীব্র করে লাগল মনের মধ্যে। কিন্তু করবে কাকে? অমন হাল যে হোতে পারে মানুষের তা ওরা শচীনন্দনকে না দেখলে ধারণাও করতে পারত না। শুধু নেওয়া হয়েছে যেন সমস্ত রক্তটুকু শরীর থেকে, মুখ চোখ গাল রগ গর্তের মধ্যে বসে গেছে। লম্বা লম্বা ডোরা কাটা একটা চেপ্টা সার্ট দিয়ে ঢাকা রয়েছে গলা থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত, সার্টটা এত বড় যে শচীর মত আরও তিনটি মানুষ ওর মধ্যে ঢুকতে পারে। সার্টের নিচে কি



আছে বোঝা যাচ্ছে না। কাপড় নেই, ঠ্যাং ছ'খানা দেখা যাচ্ছে হাঁটুর তলা থেকে। শুধু শির আর হাড়, মাংস একদম নেই। কবজির নিচে থেকে হাতের আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ভয়াবহ দৃশ্য, ঠিক যেন মড়ার হাত, মরে শুকিয়ে গেছে একদম। বোবা হোয়ে গেল ওর অবস্থা দেখে। বুকের ওপর শচীকে জাপটে ধরে আছে বরুণ, শচীর মাথাটা ওর ডান কাঁধের ওপর রয়েছে। একখানা শুকনো হাত ছই মুঠোয় ধরে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে তুলসী। কি করবে না করবে ছ'জনের কেউ ভেবেই পাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত শচীই ওদের সামলালে। বরুণের কাঁধ থেকে মাথাটা তুলে চুপি চুপি বলল—“লুকিয়ে রাখ আমায়—এ ঘরে লুকিয়ে রাখ। নয়ত আবার ওরা ধরে নিয়ে যাবে।”

“কারা!” আতঁনাদ করে উঠল তুলসী—“কারা তোমার এ হাল করলে?”

শচী জবাব দিল না, মাথাটা আবার বরুণের কাঁধের ওপর রাখল।

একদম ঠাণ্ডা গলায়, উত্তাপ উত্তেজনা রাগ ছুঁথ একেবারে বাদ দিয়ে স্থির অচঞ্চল স্বরে বরুণ সেন বলতে লাগল—“না, তা' আর তারা পারবে না শচীকা। একবার পেয়েছে তার কারণ আমি আমার কর্তব্য ঠিক মত করতে পারিনি। বাবা কাকারা তোমার ভার আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিত হয়ে চলে গেছে। আমি যদি—না না শচীকা—জ্ঞানপ্রকাশ সেনের নাতি যে অপরাধ করেছে তার ক্ষমা নেই। ক্ষমা আমি চাচ্ছি না, শুধু বলছি আর একবার তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। এবার যদি কেউ হাত দিতে আসে তোমার গায়ে তা'হলে—”

আর বলতে পারল না, গলা বুজে এল। বুঝতে পারল, শচী-নন্দনের উত্তপ্ত চোখের জলে ওর কাঁধ ভিজে যাচ্ছে।

আবার এক রাত। বরুণ সেন ভাবছে, অতঁই শেষ রজনী। হাঁ,

কোনও সন্দেহ নেই যে অতীত শেষ রজনী। রাতটা হাসছে, আকাশের  
পানে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, বড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতগুলো হোয়ে গেছে এক  
যুগ আগে, ভাঙা বাড়িটাও দাঁত ছিরকুটে হাসছে।

হাসুক, হাসতে দাও। রাতটি পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেবে  
ওরা। শচীকে পাওয়া গেছে, আর কোনও চিন্তা নেই। শচীও  
যেতে রাজী হোয়েছে। ছোটকার কাছে ওকে পৌঁছে দিতে পারলেই  
বরুণের ছুটি। আর একটি রাতও বাড়িতে কাটানো হবে না। আর  
একবার যখন সন্ধ্যা হবে তখন আর কেউ ওদের তিন জনকে ঐ  
বাড়িতে দেখতে পাবে না।

উপায় থাকলে সেই দিনই সন্ধ্যার আগে যেত। সাহস হোল না  
শচীর অবস্থা দেখে। একটা রাত ঘুমলে আর পেটে কিছু পড়লে  
খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে এই আশায় রাতটা এ বাড়িতেই কাটানো  
ঠিক হল। দোতলায় ওঠবার দরকার নেই, রাতে বারান্দা দিয়ে  
চলাফেরা করা সম্ভব নয়। যে কোনও সময় বারান্দাটা ভেঙে পড়তে  
পারে। সিঁড়ির নিচের সেই ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে ওধারের দরজা  
খুলে ফেলা হোল। ওপর থেকে বিছানাপত্র সমস্ত নামিয়ে আনা  
হোল। এক ফাঁকে একবার ওপরে গিয়ে জ্ঞানপ্রকাশের ঘরের দরজা  
খুলল বরুণ। তালা ভাঙতে হোল। বইয়ের আলমারি থেকে  
রিভলবারের গুলিগুলো বার করে নিয়ে নিজের ঘরের তালাটা দাছুর  
ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলে। ওধারে মল্লিকার মা ফিরে আসতেই  
তাকে পাঠালে নাথনু আর কুঞ্জকে ডেকে আনবার জন্তে। পাওয়া  
গেল না। মল্লিকার মা এসে জানাল যে নাথনু আর কুঞ্জ পাহাড়ে  
চলে গেছে। গাঁয়ের পুরুষরা তখনও ফেরেনি গাঁয়ে, তাই তাদের  
খোঁজ নিতে গেছে। ঠিক আছে, আর বেশী জড়িয়ে কি লাভ। রাত  
পোহালেই যখন বিদায় হচ্ছে ওখান থেকে তখন আর মায়া বাড়িয়ে  
লাভ কি।

গোপীনাথও সঙ্গে যাবে। কোনও মতেই সে আর বাড়িতে



থাকবে না। থাকবে শুধু দু'জন দরোয়ান, কর্তারা এসে পড়লে তাদের ছুটি হবে। যতদিন না আসছেন কেউ ততদিন তারা ভাঙা বাড়িটা পাহারা দেবে।

সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে। গোপীনাথ তাঁর বাক্স বিছানা গুছিয়ে ফেলছে। তুলসীর বাক্স বিছানা কিছু নেই। যা ছিল সবই সে খুঁয়িয়ে এসেছে। শচীনন্দন কি নেবে জানা গেল না। ঘুমচ্ছে ও, অঘোরে ঘুমচ্ছে। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ওর সর্বাঙ্গ ধুঁয়িয়ে মুছিয়ে দিয়েছে বরুণ। বার কয়েক একটু একটু করে গরম দুধ খাইয়েছে। দুধের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা করে ত্রাণ্ডিও দিয়েছে। তাই শান্তিতে ঘুমচ্ছে শচী। তুলসী বসে আছে ওর পাশে, অত্যধিক পরিমাণে সজাগ হয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়লেই যদি আবার সেই রকম অবস্থা হয়, এই ভয়ে মাঝে মাঝে বরুণ তুলসীকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে যাচ্ছে। ঝাঁকুনি অবস্থা দিতে হচ্ছে না, গায়ে হাত দেবার আগেই সাড়া দিচ্ছে।

গোপীনাথ আর মল্লিকার মা আছে সেই রান্না বাড়িতে। খাবার বানাচ্ছে। রান্না হয়ে গেলে সমস্ত নিয়ে আসবে ঐ ঘরে। রাতে গোপীনাথ ঐ ঘরের সামনে শুয়ে থাকবে। মল্লিকার মা গাঁয়ে চলে যাবে।

রাত বাড়ছে। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখল বরুণ নটা পঁয়ত্রিশ। আলোটায় খানিক পাম্প দিল। হাজাগুটাই জ্বালিয়েছে, বেশী আলো চাই। টিমটিমে আলোয় ঘরের ভেতরটা ভারী বিস্ত্রী বলে মনে হোল, যদিও বিস্ত্রী মনে হবার কোনও কারণই নেই। বাড়ির অগ্র ঘরগুলোর মতই ঘরখানা, শুধু ছাতটা অনেক নিচুতে। খুব মোটা চারটে কড়ির ওপর পাঁচ সার বরগা, কড়িগুলোর রঙ কালো, বরগাগুলো সাদা। যথেষ্ট ঝুল জমেছে কড়ি বরগায়, হাজাগের আলোয় ঝুলগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা চামচিকে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে ঘরে, সেই ওপরে কড়ি বরগার গা ঘেঁষে পাক খাচ্ছে। ধাক্কাও খাচ্ছে এ পাশের ও পাশের দেওয়ালের গায়ে, তারপর নামছে নিচে। নিচেও

কয়েকটা পাক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন খুঁজে পাচ্ছে না দরজাটা।  
কয়েকটা পাক দিতে দিতেই উধাও, ঝটপট করতে করতে দরজা  
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চামচিকেটা আবার আসবে, অনেক বারই  
এল গেল। আচ্ছা—একটা চামচিকেই যে বার বার যাচ্ছে আসছে,  
এ কথাই বা কে বলল! যেটা চলে যাচ্ছে, সেটা হয়তো আর আসছে  
না, আর একটা আসছে। চামচিকেদের আলাদা আলাদা করে চিনে  
রাখবার উপায় কি!

চামচিকের চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ার দরুণ ওদের পানে নজর  
রাখতে পারল না। ওপর দিকে তাকিয়ে চামচিকের কথা ভাবতে  
লাগল। কখন আসবে আবার চামচিকেটা। অনেকক্ষণ তো গেছে,  
আসছে না কেন?

আচম্বিতে একটা ধাক্কা খেল যেন। ওটা কি!

উঠে দাঁড়াল একেবারে। পকেটে হাত পুরে টর্চটা বার করে  
কড়িকাঠের গায়ে আলো ফেলল। তারপর চেষ্টা করে উঠল—“তুলসী  
তুলসী—শচীকা—”

চমকে উঠে তুলসী বলল—“কি হোল! কি দেখছেন! কি  
ওখানে?” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে। বরুণ কোনও জবাবই  
দিল না। ওপর দিকে তাকিয়ে কাঠ হোয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল শচী—“নৃতাত্ত্ব  
নৃতাত্ত্ব।”

সেই রাত্রেই নৃতাত্ত্বের কবল থেকে উদ্ধার পেল বরুণ সেন। শেষ  
মুহুর্তে জ্ঞানপ্রকাশ ঠিক ছ’বার ঐ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, শচীও  
করল। আর ছাড়াছাড়ি নয়, চেপে ধরল শচীকে। বলতেই হবে,  
ঐ কথাটার সঙ্গে যে রহস্য জড়িয়ে আছে তা জানাতেই হবে।  
শচীনন্দন রাজী হোয়ে গেল। বাঁচবেই না যখন তখন মুখ খুলতে  
আপত্তি কি। একটা লোক তবু জানুক, মুখ টিপে কতখানি সহ্য  
করেছে শচীনন্দন। জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে শচীর সম্বন্ধ কি সেটাও জানুক



জ্ঞানপ্রকাশের বংশধরেরা। ওরা জানে, শচীনন্দন মাইনে নিয়ে চাকরি করেছে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে। মাইনে নেওয়া চাকরের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে সেই রকম ব্যবহারই করেছে ওরা। নিছক পর মানুষ শচী, কর্তার সঙ্গে আছে। কি পায় না পায় তাও জানবার দরকার নেই। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, যতদিন কর্তা আছেন শচীও থাকবে। একটা মানুষ তবু রয়েছে বুড়ো বাপের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। সুতরাং বরদাস্ত করেছেন জ্ঞানপ্রকাশের ছেলেরা শচীকে, ভদ্র ভাবেই বরদাস্ত করেছেন। আসল সম্বন্ধটা এবার জানবে জ্ঞানপ্রকাশের নাতি প্রথমে, তারপর সে জানাবে তার বাবা কাকাদের। তারপর কি হবে না হবে, তা জানতে পারবে না শচীনন্দন। কারণ মেয়াদ তার ফুরিয়ে এসেছে।

তেল ফুরিয়ে এসেছে, দীপ নিভে যাবে এবার। নিভে যাবার আগে দীপটা ভাল করে জ্বলে উঠল। অনেকটা আলো ছড়াল। শচীনন্দন বলতে শুরু করল—

“তোমরা কেউ জান না তোমাদের আসল পরিচয়। তোমরা জান যে জ্ঞানপ্রকাশ সেন ছিলেন সোনার বেণে। কিন্তু আসলে তোমরা সোনার বেণে নও। তোমার দাছর যিনি বাবা ছিলেন—”

“ও ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে না শচীকা” বরুণ তাড়াতাড়ি বাধা দিল।

একটুও আশ্চর্য হোল না শচী, কোটরে বসা চক্ষু ছোটোর অন্ধকার দৃষ্টি ওর মুখের ওপর ফেলে বেশ একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—“ভালই হোল, তা’হলে আমি রেহাই পেলাম। তোমাকে যা শোনাতে যাচ্ছিলাম তা শোনাতে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিলাম না। তুমি যখন আগেই জানতে পেরেছ।”

আবার বাধা দিল বরুণ, বলল—“কতটুকুই বা জানতে পেরেছি আমি। শুধু জানি, দৈবকীনন্দন মিশ্র কে ছিলেন, তাঁর ছেলের

নামও জানি, ছেলের নাম ধেরানটাদ। আর একজনের নামও জানি। তিনি দৈবকীনন্দনের ভাই গঙ্গানন্দন, কিন্তু ও সব কথা থাকুক। তুমি আমায় লুতাতন্ত সম্বন্ধে বল। আমি জানতে চাই—”

“লুতাতন্ত সম্বন্ধে জানতে গেলে দৈবকীনন্দন সম্বন্ধেও কিছু বলতে হবে—” শচী বলতে লাগল—“দৈবকীনন্দন বহুদিন তিব্বতে ছিলেন, তিব্বতী ভাষা খুব ভাল ভাবে জানতেন। তিব্বতীদের কাছ থেকে তিনি অনেকগুলো ওষুধ পেয়েছিলেন। সোনা রূপো হীরে ভস্ম করতে জানতেন। সব চেয়ে শক্ত নাকি পারা ভস্ম করা। তাও করতে শিখেছিলেন। দেশে ফিরে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। লোকে বলত সাক্ষাৎ ঋষ্যস্তুরি। বহু টাকা রোজগার করেন দৈবকীনন্দন। ওঁর ভাই গঙ্গানন্দনকেও বহু টাকা দেন। গঙ্গানন্দন কিন্তু সর্বস্ব গ্রাস করতে চাইল। দাদার একমাত্র ছেলেকে বেদেদের কাছে—”

আবার বাধা দিল বরুণ। পাশে বসে শুনছে সব তুলসী। তুলসী যেন না জানতে পারে দৈবকীনন্দনের সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের সম্বন্ধ কি। জানলে আর রক্ষে নেই, চিরকালের জন্যে ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। তুলসীর পানে আড় চোখে তাকিয়ে শচীকে বলল—“থাকুক শচীকা, ও সমস্তও আমি জানি। এখন বল, লুতাতন্ত কি ব্যাপার। মরবার ঠিক আগে ঐ কথাটা ছ’বার উচ্চারণ করেছিলেন দাছ, তুমিও ছ’বার বললে। মাকড়সার জাল কি এমন পদার্থ যে—”

হাঁফ ধরে গিয়েছিল শচীর। দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—“বেশী কথা বলতে পারছি না, বুকে চাপ ধরছে।”

বরুণ বলল—“তা’হলে আর একটি ছুধ খেয়ে নাও, ছুধের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।”

ছুধ খেতে চাইল না শচী, বলল—“ওষুধটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর, সময় থাকতে থাকতে তোমাকে সব জানিয়ে বাই।”



জানল তুলসীও, আগাগোড়া বরুণের পাশে বসে সে শুনল এক দৈবকীনন্দন মিশ্রের কাহিনী। দৈবকীনন্দন জানতেন তিব্বতী লামারা তাঁকে রেহাই দেবে না। লামাদের মঠ থেকে যে জিনিস তিনি সরিয়ে এনেছিলেন তা তারা উদ্ধার করার চেষ্টা করবেই। লুকিয়েও থাকতে পারবেন না তিনি, লামাদের মধ্যে এমন সাধুও আছেন যারা ইচ্ছে করলেই শরীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন, সর্বত্র যেতে পারেন, সব কিছু জানতে পারেন। সত্যিই তাই হোল, অনেক দিন পরে হঠাৎ এক অতি বৃদ্ধ লামা উপস্থিত হোলেন দৈবকীনন্দনের কাছে। দৈবকীনন্দন তাঁকে গুরুর মত সেবা করতে লাগলেন। লামা ভুষ্ট হোয়ে বলে দিলেন যে দৈবকীনন্দনের পুত্রটি বেঁচে আছে। কোথায় কি ভাবে আছে তাও বলে দিলেন। লামার তখন দেহত্যাগ করার সময় হোয়েছিল। দৈবকীনন্দনকে বললেন যে শরীরটা নিয়ে তিনি আর ফিরতে পারবেন না তিব্বতে। শরীর ত্যাগ করার আগে দৈবকীনন্দনকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে চান। তিব্বত থেকে আরও মানুষ আসবে দৈবকীনন্দনের ওপর প্রতিশোধ নিতে। যে বস্তু তিনি সরিয়ে এনেছেন তিব্বত থেকে সে জন্তে শাস্তি পেতেই হবে। বিছোটা যেন তিনি অণু কাউকে না দিয়ে যান। যদি দেন তা'হলে সে ব্যক্তিরও মহা ক্ষতি হবে। ভগবান বুদ্ধের চেলারা তাকেও রেহাই দেবে না।

দৈবকীনন্দন জানতেন না যে ভাই গঙ্গানন্দন তাঁর পুত্রটিকে বেদেদের হাতে দিয়েছে। ছেলে হারিয়ে গেছে, ভাইটি আছে। ভাইকেই তিনি লামাদের বিছোটি শিখিয়ে দিয়ে যাবেন মনস্থ করে রেখেছিলেন। লামা ওঁর মনোগত অভিপ্রায়টিও জানতেন। যোগবলে সকলের মনের কথাই জানতে পারতেন সেই লামা। লামা যখন শোনালেন যে ভাই গঙ্গানন্দনই দাদার পুত্রটিকে সরিয়েছে তখন দৈবকীনন্দন ভায়ের ওপর ক্ষেপে গেলেন। লামা দেহরক্ষা করলেন, ওঁদের আইন অনুযায়ী যথাকর্তব্য সম্পন্ন করে বেরিয়ে পড়লেন দৈবকীনন্দন ছেলের খোঁজে। সে সময় একটি চোদ্দ বছরের ছেলে তাঁর সঙ্গী

হোয়েছিল। দু'দিন পরেই দৈবকীনন্দন মারা গেলেন প্রয়াগে। তাঁর কলেরা হোয়েছিল। মরবার আগে সেই চোদ্দ বছরের ছেলেটিকে বলে গেলেন, কোথায় আছে তাঁর নিজের ছেলে। একটি ছোট তিব্বতী বাস্ক ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন ধ্যানচাঁদকে দিতে। আর ঐ মন্ত্ৰটি ঐ লুতাতন্তু কথাটি শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। ঐ লুতাতন্তু কথাটিও ধ্যানচাঁদকে বলতে হবে।

সেই চোদ্দ বছরের বাচ্চা ছেলেটি দৈবকীনন্দনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

শুনতে শুনতে শ্বাস বন্ধ হোয়ে এসেছিল বরুণের। কোনও রকমে বলল—“ছেলেটিকে আমি চিনতে পেরেছি শচীকা। কিন্তু ছেলেটি কে তা' তো বললে না। দৈবকীনন্দনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ছিল?”

ম্মান হেসে শচী বলল—“তা'হলে যে ভাই সব গোলমাল হোয়ে যাবে। শচীকা' বলে আর ডাকতে পারবে না আমাকে, বলতে হবে ছোট দাছ। গঙ্গানন্দনের একমাত্র ছেলেকে চুরি করে এনেছিলেন দৈবকীনন্দন, সেই ছেলেটি একমাত্র জেঠাকেই চিনত, জেঠামশাইকে ছেড়ে এক মিনিট সে থাকতে পারত না। তাই তাকে অনায়াসে চুরি করতে পেরেছিলেন জেঠামশাই। ছেলেটিও তার মন্ত্ৰ বড় জেঠতুতো দাদাকে খুঁজে বার করে—”

স্তব্ধ বরুণ হাত বাড়িয়ে শচীনন্দনের মুখ চেপে ধরল।

শেষ রজনী, অগ্নি শেষ রজনী। আর মাত্র ঘণ্টা চারেক বাকী আছে রাত পোহাতে। একটা বেজে গেছে। বরুণ হাঁটছে ঘরটার এ মাথা ও মাথা। আর সবাই ঘুমছে। তুলসীও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল বরুণ, সম্ভব হোল না। কাকুতি মিনতি করতে লাগল ঘুমবার জন্তে। বলল, কিছুই হবে না তার, সত্যিকারের ঘুমই পেয়েছে। অগ্নি রকম কিছু হোলে সে বুঝতে পারত। বলতে বলতে দেয়ালের ধারে মেঝের গুয়ে পড়ল মুখে মাথায় আঁচল



চাপা দিয়ে। নজর রেখেছে বরুণ ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর, শ্বাস  
প্রশ্বাস বেচালে চলতে থাকলেই বাঁকুনি দেবে।

শচীনন্দনও ঘুমিয়ে রয়েছে বিছানায়। এ যাত্রা বোধ হয় টাল  
সামলাল শচীনন্দন। ওরও শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে চলছে।  
হাঁটতে হাঁটতে শচীনন্দনের পানে বার বার তাকাচ্ছে বরুণ, যেন নতুন  
মানুষ দেখছে। মহামাণ্ড জ্ঞানপ্রকাশ সেন মশায়ের সান্নাৎ কাকার  
ছেলে। বর্তমানে সেনগুপ্তির এক এবং অদ্বিতীয় কর্তা। সত্যিকারের  
পরিচয়টি যদি জানতে পারেন জ্ঞানপ্রকাশের ছেলে মেয়েরা তা'হলে  
অবিলম্বে শচীনন্দনের কপাল ফিরে যাবে। তিন তিনটি বাঘা ভাইপো  
মিলে এহেন খাতির সম্মান করতে থাকবে যে বেচারী তখন হাঁকিয়েই  
মরে যাবে হয়তো। কিন্তু জানাচ্ছে কে তাঁদের শচীনন্দনের সত্যিকারের  
পরিচয়টা। শচীনন্দন স্বয়ং জান থাকতে জানাবে না। জানাবার  
গরজও নেই। যে ভাবে এত দিন কেটেছে সেই ভাবেই ওর বাকী  
দিনগুলো কেটে যাবে।

তা কেন কাটবে!

বরুণ সেন তো এখনই মরে যাচ্ছে না। বরুণ সেন দিবিয়া বেঁচে  
থাকবে আরও বহু বছর। এত বড় ছুনিয়ার যে কোনও একটা দ্বীপে  
ঐ তুলসীকে নিয়ে সংসার কাঁদবে। সেই সংসারে থাকবেন ছোট দাছ,  
সংসারের মাথা হোয়ে থাকবেন। চাকরি তো করতেই হবে একটা  
বরুণকে, জাহাজে চড়ে সমুদ্রের বুকে ঘুরতে ঘুরতে জাহাজের হৃদ-  
পিণ্ডকে ঠিক রাখা ছাড়া অণু কি চাকরি করবে সে! যখন দরিয়ার  
বুকে ভেসে বেড়াবে সে তখন দিবিয়া কাটবে তুলসীর ছোট দাছ যদি  
সংসারে থাকেন। নয়ত বেচারীকে একলা থাকতে হবে।

সোনার সংসার, ছোট একটি দ্বীপ, কয়েক ঘর বিচিত্র মানুষ, তাল  
নারকেলের বন, একখানি ছোট কাঠের বাড়ি, সমুদ্রের ঢেউ, তাঁদের  
আলো, সবই সোনামাথা স্বপ্ন। বোল আনা সজাগ বরুণ সেন হাঁটতে  
হাঁটতে সোনার স্বপ্ন দেখতে লাগল। জেগে বা ঘুমিয়ে কোনও

অবস্থাতেই কোনও দিন নিজেকে জড়িয়ে কোনও স্বপ্ন দেখেনি সে,  
 স্বপ্ন দেখার সুযোগই হয়নি। খাওয়া খাটা আর ঘুমনো এই তিনটি  
 ব্রত সম্বল করে পৃথিবী গ্রহটাকে হ্রদয় প্রদক্ষিণ করে বেড়িয়েছে।  
 নারী বহুবীর নাগালের মধ্যে এসে গেছে, ফিরে তাকাবার ফুরসত  
 পায়নি। প্রেমে পড়েছিল বরুণ সেন এই পৃথিবী গ্রহটার সঙ্গে।  
 এই গ্রহটায় এসে কতটুকুই বা এর দেখা হোল। কিই বা জানা গেল  
 এই গ্রহটি সম্বন্ধে! বিচিত্ররূপিণী ধরণী ওর মন বুদ্ধি দখল করে  
 রেখেছিল। এবার বেদখল হোল। রক্তে মাংসে গড়া এক মানবী  
 বেদখল করলে। মাটি পাথর সমুদ্র আকাশ নয়, রক্ত মাংসের স্বপ্ন  
 দেখতে লাগল বরুণ সেন। জ্যান্ত রক্ত মাংস, ঐ যে ঐ দেওয়ালের  
 পাশে আঁচল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে।

মনে মনে বলল—হাঁ, এই ভাবেই নিশ্চিন্তে ঘুমতে পাবে তুমি  
 এখন থেকে। আর তোমাকে কেউ জ্বালাতে পারবে না। জ্যান্ত  
 কিংবা মৃত, যে কেউ হোক, বরুণ সেনের সঙ্গে লড়াইতে হবে তাকে  
 তোমার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করতে হোলে। এবং বরুণ সেনের  
 হিম্মত আছে—

হিম্মত হিম হোয়ে গেল। ছুঁ ছুঁবার কানে গেল সেই ডাক—  
 “বরুণ বরুণ—”

ভয়ানক রকম চমকে উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তুলসীর  
 দিকে। নিচু হোয়ে দেখতে লাগল ওর ঘুমন্ত দেহটা। ঠিকই তো  
 আছে, শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকই তো পড়ছে। তা’হলে! শুনতে ভুল  
 হোল নাকি!

তবু ওঠানো যাক ওকে, অনেকক্ষণ তো ঘুম হোল। আর কেন!  
 আর একই নিচু হোল ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকবার জন্তে।  
 হাত আর দিতে হোল না। আবার সেই ডাক কানে গেল—“বরুণ  
 বরুণ।” বুঝতে পারল, কোথা থেকে ডাক দেওয়া হচ্ছে।

আস্তে আস্তে মোজা হোল। আস্তে আস্তে জড়পিণ্ডের মত ঘুরে



তাকিয়ে রইল শচীর দিকে। হাত পা নাড়বার সামর্থ নেই, যা বুঝতে  
পেরেছে তা যেন সত্যি নয়।

কে ডাকল! শচী!

ঐ ভাবে শচী ডাক দিলে!

কেন! হোল কি ওর! মরে গেল নাকি!

জানন্ত মানুষে কি ঐ ভাবে ডাকতে পারে!

এটা ওটা সেটা, সংশয় সম্ভ্রাস আরও কতকি একই সঙ্গে তোলপাড়  
করতে লাগল বুকের মধ্যে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তারপর আবার  
এক ধাক্কা খেল। স্পষ্ট কানে গেল কথাগুলো—“বরুণ শোন, ও ভাবে  
খ মেরে গেলি কেন। হাঁ, আমি বলছি, আমি তোরা দাচ্ বলছি।  
এবার আর তুলসীর মুখ দিয়ে বলছি না, শচীর মুখ দিয়ে বলছি। বহু-  
বার শচী আমার মিডিয়াম হয়েছে। তুলসী আসবার পরে ওকে  
ছেড়ে দিলাম। ওর মন খুবই সজাগ, ওর মনকে ঘুম পাড়ানো সহজ  
নয়। আজ ওর মন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ওর ভেতর থেকেই তোরা  
সঙ্গে কথা বলছি।”

টোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে বরুণ বলল—“বল কি বলবে।  
আমার কিন্তু আর ভাল লাগছে না কিছু শুনতে। শচীবাবু মানে  
ছোট দাচ্ ফিরে এসেছেন। সকাল হোলেই আমরা এখান থেকে  
চলে যাব।”

“কোথায় পালাবি? লুতাতন্ত থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পাবার  
উপায় নেই। যেখানে যাবি ঐ জাল সেখানেও—” অতি ভয়াবহভাবে  
ফিসফিস করে প্রতিটি বাক্য উচ্চারিত হোল। কথাগুলো যেন ঘুরে  
বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। স্পষ্ট দেখতে পেল বরুণ কতকগুলো  
ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে ভাসছে। হঠাৎ থেমে গেল সেই ফিসফিস  
আওয়াজ। শচীনন্দনের পানে তাকিয়ে স্থির হোয়ে অপেক্ষা করতে  
লাগল বরুণ, এই বুঝি কিছু আবার বলতে শুরু করবে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হোল, শচীর শরীরটা বিছানা ছেড়ে

একটু একটু করে উঠছে যেন। সত্যিই উঠছে, কোমর থেকে পিঠ ঘাড় মাথা সোজা উঠতে লাগল। খানিকটা উঠে স্থির হয়ে রইল। ঠিক যেন ওর পিঠ আর মাথার নিচে বালিশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন ভাবে বসে রইল শচীনন্দন। হাওয়ায় হেলান দিয়ে ঐ ভাবে স্থির হয়ে থাকতে পারে কেউ, স্বচক্ষে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়েছে তখন বরুণ সেন। বাহজ্ঞান শূন্য অবস্থায় তাকিয়ে রইল সে শচীর মুখ পানে। কোর্টরে বসা চোখ ছুটোর মধ্যে জমাট অন্ধকার, চোখ ছুটো রয়েছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সেই অবস্থায় কি যেন আওরাতে শুরু করল শচীনন্দন। কি বলছে বোঝাই গেল না। একটানা অস্পষ্ট গোঙানি বেরুতে লাগল ওর ভেতর থেকে, ক্রমেই চড়তে লাগল আওয়াজটা, একটা হিংস্র জানোয়ার গর্তের ভেতর থেকে গজরাতে লাগল যেন। গজরাতে গজরাতে হঠাৎ একটা বিকট হুংকার ছাড়ল জানোয়ারটা। পরমুহুর্তে বরুণ দেখল শচীনন্দন সোজা হয়ে উঠে বসেছে।

হঠাৎ ওর একপাশে সজোরে ধাক্কা লাগল, ছিটকে সরে গিয়ে কোনও রকমে টাল সামলে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখল, তুলসী শচীনন্দনের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আবার একটা বিদ্যুটে আওয়াজ হোল। তারপর শুনতে পাওয়া গেল তুলসীর গলা। শচীকে বিছানার ওপর চেপে ধরে আছে তুলসী সর্বশরীর দিয়ে, সেই অবস্থায় বলছে—“জল আনুন শিগ্গির, এক গেলাস জল আনুন, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে হবে।”

হুঁশ ফিরে পেল বরুণ। এক বালতি জল এনে রেখেছিল গোপীনাথ, ছুটে গিয়ে বালতিটাই নিয়ে এল। শচীকে ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল তুলসী, বালতির ভেতর আঁচল ডুবিয়ে আঁচলটাই শচীর মুখের ওপর চেপে ধরলে।



কি হোয়েছিল জানতে চাইল বরুণ তুলসীর কাছে। তুলসী বলল সাংঘাতিক কথা। অন্য কোনও প্রেত এসেছিল, সেই প্রেত চেষ্টা করছিল শচীকে খাড়া করবার। যদি খাড়া হোয়ে দাঁড়াত শচী তা'হলে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলত বরুণকে। ধরে দম বন্ধ করে মারবার চেষ্টা করত।

একটু শিউরে উঠল বরুণ। তারপর খুব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞাসা করল—“তোমাকে তো মারল না। দিব্যি কাবু করে ফেললে তুমি প্রেতটাকে। তোমার তো দেখছি ভয়ানক শক্তি।”

তুলসী বলল—“গায়ের জোরে নয়, অন্য ব্যাপার। আমি ছুঁয়ে ফেলতেই শচীবাবুর মন জেগে উঠল।”

“যদি আমি ছুঁতাম তা'হলে কি হোত? ছুঁয়ে দিলেই প্রেতটা পালিয়ে যেত?” অবুঝের মত আবার প্রশ্ন করল বরুণ।

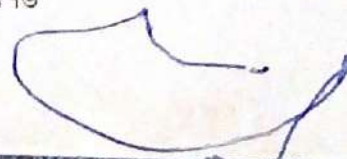
এইবার শিউরে উঠল তুলসী। শিউরে ওঠাটা স্পষ্ট দেখতে পেল বরুণ। একটুখানি কি ভেবে নিয়ে তুলসী বলল—“আপনি ছুঁলে কি যে হোত বলা মুশকিল। সেই অবস্থায় যদি আপনার একটা হাত ধরে ফেলতেন শচীবাবু তা'হলে হাতখানা খোয়াতেন। যে প্রেত ওঁকে অধিকার করেছিল সে আপনার শত্রু। আপনাকে ধরতে পারলে—”

বরুণ ওঁকে থামাল। বলল—“থাক, এ আলোচনার আর দরকার নেই। আর ঘণ্টা দু'য়েক রাত আছে। দুটো ঘণ্টা কোনও রকমে পার করতে পারলে হয়।”

তুলসী আর কিছু বলল না। বসে রইল ওরা দু'জনে শচীনন্দনের ছু পাশে, ওঁকে ছুঁয়ে বসে রইল। ছুঁয়ে থাকলে নাকি প্রেতাবেশ হবার উপায় থাকে না।

ভোর হোয়ে আসছে তখন। দরজার সামনেটা ফিকে হোয়ে উঠেছে।

বরুণ বলল—“এবার ডাকা যাক গোপীনাথকে। সেই যে শুয়েছে,



এ পর্যন্ত একবার উঠলও না। ঘরের ভেতর তিনজন মরে রইলাম না  
জ্যন্ত রইলাম, সে খোঁজ নিতে বয়ে গেছে গড়গড়ি ঠাকুরের।  
আমাদের পাহারা দেবার জন্তেই নাকি শুয়েছে রোয়াকে, আচ্ছা  
পাহারা দিলে বটে।”

তুলসী বলল—“পাহারা দেবার জন্তে নয়, বাড়ি চাপা পড়বার  
ভয়ে খোলা আকাশের তলায় শুয়েছেন ঠাকুরমশাই। ভয়ানক ভয়  
করেন উনি মরণকে।”

“কে ভয় করে না। তুমি ভয় পাও না মরতে?” বাঁকা সুরে  
প্রশ্নটি করে উঠে দাঁড়াল বরুণ, এগিয়ে চলল দরজার দিকে। তুলসীর  
জবাবটি কানে গেল—“মরণ নেই আমার, যদি মরতে পারতাম—”

কথা কটি এমন ভাবে বলল তুলসী যে বরুণের ছ'খানা পা পাথর  
হোয়ে গেল যেন। অব্যাহত নিঃশ্বাস একটা ঠেলে উঠেছিল বুকের ভেতর,  
কষ্ট করে সেটাকে চেপে জোর করে পা চালালে। আর একবার  
নিজেকে নিজে শুনিয়ে দিলে সঙ্কল্পটি—“আর এক বেলাও নয়, এখনই  
বেরিয়ে পড়তে হবে, পাপপুরীতে আর এক বেলাও তোমাকে থাকতে  
হবে না।”

দরজা খুলে বাইরে বেরুল। গোপীনাথকে তুলে একার জন্তে  
পাঠাতে হবে। খান তিনেক একা নিয়ে আসুক। শচীনন্দনকে  
শুয়িয়ে নিতে হবে। ষ্টেশন পর্যন্ত কোনও রকমে পৌঁছতে পারলে হয়।

কোথায় গেল গোপীনাথ এত ভোরে। মাতুর চাদর বালিশ পড়ে  
রয়েছে, মানুষটা নেই। গেল কোথায় বুড়ো। খুব সম্ভব পুকুরে গেছে  
মুখ হাত ধুতে, এখনই এসে পড়বে।

পায়চারি করতে লাগল রোয়াকে। উত্তপ্ত মগজ ভোরের হাওয়ায়  
জুড়িয়ে এল। দরজা জানলা বন্ধ ঘরটা সত্যিই যেন প্রেতপুরী,  
সারাটা রাত ঐ প্রেতপুরীতে বন্ধ থাকতে হয়েছে। শচীনন্দন তো  
এখন ঘুমিয়ে রয়েছে, তুলসীও আসুক না বাইরে। ঠাণ্ডা হাওয়ায়  
ঘুরলে খানিকটা শান্তি পাবে।





চলল আবার ঘরে তুলসীকে ডেকে বার করবার জন্যে। প্রায় পৌঁছে গেছে দরজার সামনে, তুলসী বেরিয়ে এল। বেরিয়েই চৌঁচিয়ে উঠল—“এই যে, এত ভোরে তোমরা—”

ফিরে তাকাল বরুণ। দেখল, নাথনু আর কুঞ্জ বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে।

ওদের দিকে নজর পড়তেই নাথনু কুঞ্জ কয়েক মুহূর্ত কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর লাগালো দৌড়, ছুটতে ছুটতে নাথনু চৌঁচিয়ে উঠল—“কোথায় ছিলি বাবু? কোথায় লুকিয়ে ছিলি তোরা?”

কুঞ্জ একটা বিচিত্র শব্দ বার করল গলা দিয়ে, লাফ মেরে রোয়াকের ওপর উঠে বরুণের একটা হাত চেপে ধরলে। এমনই উত্তেজিত হোয়ে উঠেছে যে গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

আবার চৌঁচিয়ে উঠল নাথনু—“বঁচে আছিস তা’হলে! তোদের তা’হলে তারা খুঁজে পায়নি!”

কুঞ্জ বলল—“ঐ লোকটাকে গাছের ডালে ঝুলতে দেখার পর থেকে আমরা তোদের খুঁজছি।” তুলসী যেন কি বলতে গেল। বরুণ লাফিয়ে পড়ল নাথনুর পাশে। একটা অব্যক্ত আর্তনাদ বেরুল ওর গলা দিয়ে।

নাথনু হাত তুলে দেখিয়ে দিলে—“ঐ পুকুরের কোণে, একটা গাছের ডালে ঝুলছে।”

খুন।

লাশ নামিয়ে ভাল ভাবেই বোঝা গেল যে খুন করা হোয়েছে। নাক মুখ থেঁতলে ফেলা হোয়েছে। যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সে আগে নাক মুখ থেঁতলে নেয় না। তা’ছাড়া এ ভাবে কেউ নিজের মুখ থেঁতলাতে পারে না। মুখখানাকে খুব সম্ভব মেঝের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ঐ রকম করা হোয়েছে। আগে মেরে তারপর গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে।

তৎক্ষণাৎ সবই ভুলে গেল বরুণ সেন। অভিগণ্ড বাড়ি ছাড়বার কথা মনের কোণেও আর একবারও উদয় হোল না। শোক হুঃখ নয়, গোপীনাথ গড়গড়ি মরে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় কষালে যেন তার হুই গালে। চড় কষিয়ে গড়গড়ি বলতে লাগল—“তুমি না কর্তাবাবুর নাতি! দাছুর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে দাছুর নাতি বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবে তো। আত্মীয় স্বজনের সামনে মুখ দেখাবে কেমন করে!”

অসম্ভব জ্বলুনি, চোখ মুখ নাক কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল। নতুন একটি সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করল সেই মুহূর্তে—হিসেব মেলাতে হবে।

কি করে মিটবে হিসেবটা।

বদলা নিয়ে। খুনের বদলা খুন—সোজা হিসেব—এতটুকু গোঁজামিল নেই।

জ্ঞানপ্রকাশ সেনের নাতি বরুণ সেন গোঁজামিল দিয়ে হিসেব মেলাতে পারে না।

তা' ছাড়া—

শুকনো জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আড় চোখে একটি বার তাকাল বরুণ সেন তুলসীর পানে। সে চাউনিতে স্বপ্ন নেই, সে দৃষ্টি বিষদৃষ্টি। বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলল—“ঐ নারী জানবে যে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা না করে গোপীনাথের জন্তে বদলা না নিয়ে বরুণ সেন পালিয়ে বাঁচল। বাকী জীবনটা ঐ নারীর সামনে যদি কাটাতে হয়!”

স্বপ্ন ভঙ্গ হোল। অথবা এ কথাও বলা যায়, সোনার স্বপ্ন পুড়ে ছাই হোতে চলল গোপীনাথের চিতায়। তাড়াতাড়ি চিতার ব্যবস্থা করতে লাগল বরুণ, গোপীনাথের সঙ্গে তার সোনার স্বপ্নগুলোকেও পোড়াতে হবে।



দরোয়ান ছুটো ভেগেছে তাদের মালপত্র নিয়ে। ভালই হোল, ওরা থাকলে সহজে সামলানো যেত না ব্যাপারটা। নাথনু কুঞ্জকে বিশ্বাস করা যায়, ওরা নিজেরাই মানল যে খুনটাকে বেমানুম হজম করা চাই। সরকারী হুজুররা খবর পেলে খামকা হাঙ্গামা বাড়বে। তাঁরা এসে লাশ চালান দেবেন সেই সহরের চেরাইখানায়। তারপর নাথনু কুঞ্জকে নিয়েই হয়তো টানা হ্যাঁচড়া জুড়ে দেবেন। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, সুতরাং থাকুক ঐ সমস্ত সরকারী আদব কায়দা শিকেয় তোলো, তাড়াতাড়ি গোপীনাথকে চিতেয় চড়ানো যাক। গোপীনাথ বুড়ো হয়েছিল, ভুগছিল নানান রোগে, হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে। একদম স্বাভাবিক মৃত্যু, কোনও গোলমাল নেই।

গোলমাল কিছু হোলও না। জনা চারেক মানুষ ডেকে আনল গাঁ থেকে কুঞ্জ, নাথনু একখানা শুকনো কড়ি চেলিয়ে ফেললে। গাঁয়ের মড়া যেখানে পোড়ানো হয় সেখানে নিয়ে যাওয়া হোল শব! আগাগোড়া সব সময় তুলসী বরণের সঙ্গে রইল। মল্লিকার মা এসে গোপীনাথের জন্তে খানিকটা দেহাতী কান্না কাঁদলে সুর করে। এক ফাঁকে গোপীনাথের বাস্তটাকে চালান করে দিলে মেয়ে জামাইয়ের কাছে। তারপর শচীনন্দনের সেবায় লেগে গেল।

কুঞ্জকে শচীনন্দনের পাহারায় রেখে শ্মশানে গেল ওরা। জ্বলে উঠল গোপীনাথের চিতা, সেই চিতার আগুনের সঙ্গে মিশল বরণ সেনের মনের আগুন। দুই আগুনে পুড়তে পুড়তে একটি সঙ্কল্প খাঁটি ইম্পাতে পরিণত হোল। ইম্পাতটিতে গড়া হোল একখানি চোখ ঝলমানো তরবারি, সেই তরবারির গায়ে ফুটে উঠল—“বদলা নিতে হবে!”

বদলা নেবে কাদের ওপর।

যাদের ওপর বদলা নেবে তাদের চেনে না, তাদের ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। যারা শচীনন্দনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারাই কি খুন

করল গোপীনাথকে ! ও বেচারাকে খামকা খুন করবার উদ্দেশ্য কি !

দাছ যদি জানায় ! স্বয়ং জ্ঞানপ্রকাশ সেন বা ধেয়ানচাঁদ মিশ্র যদি দয়া করে জানান।

নিশ্চয়ই জানাবে দাছ। শত্রুদের নাম পরিচয় পেলেই হোল, তারপর যা করতে হবে তা' করবে নাতি বরুণ সেন। বরুণ সেন তর্পণ করবে তার দাছর, সে তর্পণের মন্ত্র আলাদা উপচার আলাদা। এখন শুধু সেই দুশমনদের নাম পরিচয় পেলেই হয়।

শচীনন্দন বলেছে, তাদের পরিচয় পেতে দেরি হবে না। তারা ছাড়বার পাত্র নয়, নিজেরাই তারা পরিচয় দিতে আসবে।

কারা তারা ?

তা' জানতে পারেনি শচীনন্দন। জানবার উপায় ছিল না। একটা কাঠের সিন্দুকে পুরে শচীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা, সেই সিন্দুকের ভেতরেই বন্ধ করে রেখেছিল। আব্দুল গলতে পারে ঐ রকম কয়েকটা ফুটো ছিল সেই বাস্তের গায়ে, তার ভেতর দিয়ে হাওয়া যেত। সেই ফুটোগুলোর ওধারে মুখ নিয়ে অনবরত শচীকে জিজ্ঞাসা করা হোত—“লুতাতন্ত কোথায় লুকানো আছে বলে দাও, যদি বল তাহ'লে বাঁচবে, নয়ত ঐ সিন্দুকের ভেতরেই বিনা জলে শুকিয়ে মরতে হবে।”

বলতে পারেনি শচী, কারণ সত্যিই সে জানে না কোথায় আছে সেই বস্তু। ফলে তাকে মরতেই হোল। মানে—মরে গেছে মনে করেই সেই ঝড় জলে তাকে ফেলে রেখে যাওয়া হোল ঐ বাড়ির ফটকের সামনে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ার দরুণ আবার বেঁচে উঠল শচী, হাঁ করে বৃষ্টির জল গিলতে গিলতে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িতে এলসে, রোয়াকে উঠতেই দেখতে পেল এক লামাকে। লামা তখন টলতে টলতে বারান্দা দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ ছড়মুড় করে একটা থাম ভেঙে পড়ল। তারপর কি হোল দেখেনি শচী, দেখবার মত অবস্থা ছিল না। বাঁচবার জন্তে শেষ চেষ্টা করল সে, সিঁড়ির তলায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ির তলায় থাকার



দরুণ বাড়িটা ভেঙে পড়লেও হয়তো বেঁচে যাবে, এই আশাতেই সে  
ওখানে ঢুকে পড়েছিল।

শুনতে শুনতে একটিমাত্র প্রশ্ন করল বরুণ—“দরজাটা খুললে  
কেমন করে, আমি তো তালা লাগিয়েছিলাম।”

শচী বলল, দরজা তাকে খুলতেই হয়নি। ছুঁখানা কপাটই হাট  
করে খোলা ছিল। ঘর খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিল সে, তারপর  
ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। দমাদম লাথির শব্দে  
হুঁশ হয়, তখন উঠে দরজা খুলে দেয়।

আর কথা বলতে দেয়নি শচীকে, বেশী কথা বললে আরও দুর্বল  
হোয়ে পড়বে। থাকুক শান্তিতে শচীনন্দন সামন্ত। উঁহু—মিশ্র,  
সামন্ত নয়। ধেয়ানচাঁদ মিশ্রের কাকার ছেলে শচীনন্দন মিশ্র।  
ধেয়ানচাঁদ মিশ্র মহাশয়ের নাতি বরুণ মিশ্র, বরুণ মিশ্রের ধমনীতে  
যে জাতের রক্ত বইছে, শচীনন্দনের রক্তও সেই জাতের। শচীনন্দনকে  
এক গণ্ডুষ জল পর্যন্ত দেয়নি। কি অবস্থায় কেটেছে ওর দিন রাত-  
গুলো সেই কাঠের বাজটার ভেতরে।

কল্পনা করতে গেল অবস্থাটা। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের রক্ত মাথায়  
চড়তে লাগল। আর একবার মনে মনে আওড়ে নিল—বদলা নিতে  
হবে। গোপীনাথের জন্ম বদলা নিতে হবে, ঐ শচীনন্দনকে বাস্তব পুরে  
যে যন্ত্রণা দিয়েছে তার জন্তেও উপযুক্ত দাম দিতে হবে তাদের। দাম  
না নিয়ে বরুণ সেন, না না মিশ্র, বরুণ মিশ্র ওখান থেকে নড়ছেন না।

আশুক তারা পরিচয় দিতে। অথবা বরুণ মিশ্রের পরিচয় নিতে।  
একটিবার আশুক। হে ভগবান, শচীনন্দনের কথা যেন ফলে যায়।

ভগবান কে, কি তাঁর ক্রিয়াকলাপ তা জানে না বরুণ। ভগবান  
নিয়ে কস্মিনকালে সে মাথাও ঘামায় না। ঝড় তুফান উঠলে জাহাজের  
লোকেরা ভগবান ভগবান করে, বরুণ সেন তাও কখনও করেনি।  
ভগবানকে বাদ দিয়েই এ পর্যন্ত পরম নিশ্চিন্তে কেটেছে তার দিনরাত-

গুলো। এই প্রথম তার মনে হোল ভগবানের নাম। বিপদে পড়ে  
নয়, একদম অগ্র কারণে। বদলা নেবার জন্তে স্মরণ করে বসল  
ভগবানকে।

একটিবার তাদের পরিচয়টি জানিয়ে দাও ভগবান, তারপর আমি  
দেখিয়ে দোব ঠিকঠাক হিসেব মিলিয়ে বদলা নিতে পারি কি না।

ভগবান বোধ হয় কান খাড়া করে ওর প্রার্থনাটি শুনলেন।

ভোর থেকে তুলসী মুখ বুজে আছে। কি যেন হয়েছে ওর,  
গোপীনাথের মৃত্যু তুলসীকে বোবা কালা বানিয়ে ফেলেছে। মুখ দেখে  
বোঝবার উপায় নেই কি ভাবছে তুলসী। খুব সম্ভব কিছুই ভাবছে  
না। শুধুই তাকিয়ে আছে। যেমন নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে ছিল  
গাছ থেকে ঝুলন্ত গোপীনাথের পানে তেমনি ভাবে আগাগোড়া  
তাকিয়ে রইল। সমস্ত দেখল বরুণের পাশে বসে, চিতা জ্বলল চিতা  
নিভল, সকলের সঙ্গে ফিরে এল বাড়িতে। সকলে স্নান করল,  
তুলসীও করল। কলের পুতুলের মত নড়ছে চড়ছে যা করার করছে,  
একটি কথাও কইছে না, মুখ চোখের এতটুকু ভাবান্তর হচ্ছে না।  
সন্ধ্যার পর থেকে এক ভাবে বসে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, চোখের  
পলক পড়ছে না। কি দেখছে ও!

অনেকবার ঐ প্রশ্নটি উদয় হয়েছে বরুণের মনে—ঐ রকম  
অনিমেয় দৃষ্টিতে কি দেখছে ও!

কিছুই দেখছে না। কিংবা এমন কিছু দেখছে যা বরুণের দৃষ্টিতে  
ধরা দিচ্ছে না। ঐ রকম অবস্থায় থাকতে থাকতেই সেই ব্যাপারটি  
ঘটবে, দাছ এসে ওর ভেতর থেকে কথা বলবে। অপেক্ষা করছে বরুণ,  
প্রতি মুহূর্তে আশা করছে, এই বুঝি দাছ ডাক দিলে। ছ একবার  
ভুল হোল, মনে হোল যেন শুনতে পাচ্ছে সেই ডাক—বরুণ বরুণ।  
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তুলসীর মুখপানে চেয়ে রইল। কিছুই হোল না, পাথরে  
গড়া মূর্তির মত তুলসী বসে রইল।



আগের রাতের মত আজাগ্‌টা জ্বলছে ঘরে, কিন্তু দরজা বন্ধ নেই। দু'খানা কপাটই সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। দরজার সামনে রোয়াকের ওপর আলো পড়েছে। কেউ যদি আসে, ঘরে ঢুকতে তার মোটেই কষ্ট হবে না। কিন্তু এই ঘর থেকে বেরুতে হবে না তাকে পায়ে হেঁটে। ওরা পাঁচ জন মিশে আছে অন্ধকারে, ওদের হাতে আছে কাঁড়। কাঁড় থেকে যা ছুটে আসবে নিঃশব্দে তাতে জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুক খতম হয়। চৌকাঠের এপারে একটবার পা দিলেই লুটিয়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে, সোজা হোয়ে আর দাঁড়াতে হবে না।

টোপ ফেলা হোয়েছে, মানুষ টোপ। তিনটে মানুষ রয়েছে ঘরের মধ্যে, তিন তিনটে জ্যান্ত টোপ। এখন চারে মাছ এলেই হয়।

ভেতরে ভেতরে অস্থির হোয়ে উঠছে বরুণ সেন। রাত বহে যাচ্ছে, উজান শেষ, এবার ভাটির টান ধরল। তার মানে যারা আসবে বলে আশা করছে তারা অত্যধিক রকম হুঁশিয়ার। কিছুতেই কাঁদে পা দেবে না।

একমাত্র আশা দাছ। দাছ যদি বলে দেয় তাদের পরিচয়। একটা যন্ত্রের পানে যেমন ভাবে তাকায় মানুষ সেইভাবে তাকিয়ে রইল তুলসীর পানে। যন্ত্রটা কথা কইবে, ঐ যন্ত্রের ভেতর দিয়েই দাছ বলবে। যন্ত্রটা কিন্তু এতটুকু নড়ছেও না। বিগড়ে গেল নাকি!

বয়লার নয় যে হাতিয়ার নিয়ে মেরামত করতে লেগে যাবে। ধাক্কাধুকি দিয়ে দেখতেও সাহস হোল না, ধাক্কা ঝাঁকুনি দিলে আবার ঐ ভাবটা কেটে যায়। আগের রাত্রে বহুবার ঝাঁকুনি দিতে গেছে পাছে প্রেত এসে দখল করে ঐ যন্ত্রটাকে। এ রাত্রে ঠিক বিপরীত আশা করে বসে রইল, নিশ্চয়ই আসবে দাছ, নিশ্চয়ই ঐ যন্ত্রটার ভেতর থেকে ডাক দিয়ে উঠবে।

আর যদি বিগড়েই গিয়ে থাকে যন্ত্রটা, তা'হলে কি হবে!

বিগড়ে যাওয়া যন্ত্রের যা গতি হয় তাই। ইংরেজী কথাটাই মনে এসে গেল—স্ক্যাপ্! কোটি কোটি টাকা খরচা করে যে জাহাজ

বানানো হয়, সেই জাহাজ যখন অচল হয়, তখন তার পরিণতি কি !  
জ্ঞাপ্।

মাত্র একটি দিন, একটিবার মাত্র সূর্য উদয় হয়েছিল এবং অস্ত  
গেছে, ঐ সময়টুকুর মধ্যে কি ভয়ঙ্কর ওলট পালটই না হয়ে গেল  
তুলসীর জীবনে ! আগের রাত্রে যে ছিল নারী, পরের রাত্রে সে একটা  
যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। ম্যারীন্ এন্জীনিয়ার বরণ দেন ভাবছে, যন্ত্র  
যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে তা'হলে তার গতি কি হবে ! জ্ঞাপ্, ভেঙে  
টুকরো টুকরো করে ওজন দরে নিলামে চড়বে।

হঠাৎ একটু নড়ে উঠল তুলসী, কি যেন আওড়াতে লাগল বিজবিজ  
করে। আওড়াতে আওড়াতে উঠে দাঁড়াল। তখনও চোখের পলক  
পড়ছে না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখনও জ্বলন্ত হাজারগটার  
পানে। সেই রকম অবস্থায় টলতে টলতে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

ব্যাপারটা কি ঘটছে মাথায় ঢুকতে কয়েকটি মুহূর্ত দেরি হোল।  
তারপর এক লাফে ওর সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল বরণ। চাপা  
গলায় বলে উঠল—“কোথায় চললে মরতে ?”

শুনতেই পেল না তুলসী, দেখতেও পেল না যেন সামনে কে  
দাঁড়িয়েছে। সোজা ছ'পা এগিয়ে গিয়ে পড়ল বরণের বুকের ওপর।  
প্রচণ্ড ধাক্কা, ধাক্কা নয় ঠিক, ভয়ঙ্কর ভারী একটা জিনিষ আচমকা  
বুকের ওপর পড়ে যা হয় তাই, টাল সামলাতে পারল না বরণ, সরে  
গেল এক পাশে। পথ পরিষ্কার হোল, তুলসী দরজার সামনে পৌঁছে  
চৌকাঠ পার হোল।



শেষ হয়ে গেল তুলসীর আত্মকাহিনী।

তার মানে—ঐটুকুই আমাকে জানিয়েছিল তুলসী। ওর ধারণা, ঐটুকুর বেশী আর কিছু জানাবার নেই। জ্ঞানপ্রকাশের বাড়ি ছাড়বার পরে আর কি শোনাবার থাকতে পারে!

ওর সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম। বলতে পারতাম, শেষ হোল না। অসমাপ্ত কাহিনী নিয়ে কিছুই আমি লিখতে পারব না, এ কথা ওকে জানিয়ে দিতে পারতাম। প্রবৃত্তি হোল না। ঠিক আছে, যেটুকু বলেছে সেইটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্য আছে। আমি যে পেশাদার গল্প লিখিয়ে। আমি জানি পাঠক পাঠিকারা কি চান। তাঁদের আমি ঠিকাই কেমন করে।

তাই কচিবাবুর শরণাপন্ন হোলাম। অতএব এইবার যা লিখছি তা' কচিবাবুর কাহিনী, তুলসীর নয়।

“আমি স্মার—” কচিবাবু তাঁর নিজস্ব চঙে শুরু করলেন—“ছাড়বার পাত্র নই জানেনই তো। স্নার খুঁজতে খুঁজতে ঠিক বার করে ফেললাম বলদেও মিশিরকে। লোকটা স্মার পয়লা নম্বরের ঘুঘু। কিছুতেই ঘাড় নোয়াবে না। তখন কষলাম পঁচ, এক চালান কালামাণিক আনিয়েছিল বলদেও পাহাড় ডিঙিয়ে, চালানটা আটকালাম। তখন ব্যাটা তেলপানা হয়ে গেল।”

“কালামাণিক আবার কি!” জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

কচিরাম চোখ উলটে ইশারায় বুঝিয়ে দিল—আফিম। আফিমকে ওরা আদর করে কালামাণিক নাম দিয়েছে।

“সেই যে স্ত্রীর লামাদের মঠ, সেই মঠই হচ্ছে চোরাই কারবারের ঘাঁটি। এপার থেকে বলদেও চাল গম চিনি থেকে শুরু করে কাপড় কম্বল ওষুধপত্র পর্যন্ত চালান দেয়, দাম নেয় শ্রেফ কালামাণিক। ফলাও কারবার। দিদি তো জেলে বসে আছে। এখানে আমি শুরুক সন্ধান করে বার করে ফেললাম সব। জেলটা হোল কেন? না—বলদেও মিশিরের বাঁড়িতে চুরি করেছিল বলে। বলদেও মিশিরটি কে? ওরে বাববা! ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখি—শ্লা একটি গভীর গাঙের গোহাড়গেল। ঠিক আছে শ্লা, এবার তুমি যাচ্ছ কোথায়। ঘুঘুই দেখেছ জাহ্ন, ফাঁদ তো দেখনি। কচিরাম ফাঁদ পাতলে সব শ্লার চিড়িয়ে গলা বাড়িয়ে ধরা দেয়।”

অতঃপর নিজের ভাষায় কচিরামবাবুর কাহিনীটি শোনাই। ওঁর ভাষায় ওঁর ফোড়ন মসলাসহ সেই সুখাত্ত পরিবেশন করার সামর্থ্য নেই আমার, পরিবেশন করলেও সেই অপূর্ব ব্যাল্লন অনেকে হজম করতে পারবেন না। এখন সরল ভাষায় শুধুন বলদেও মিশিরের পরিচয়।

দৈবকীনন্দন মিশ্রের কাকার ছেলে সুখদেব মিশ্র। সুখদেব মিশ্রের পুত্র বলদেব মিশ্র দৈবকীনন্দন মিশ্রের পুত্র ধেয়ানচাঁদ মিশ্রের জ্ঞাতি। ঐ বাড়িখানি ধেয়ানচাঁদকে বা জ্ঞানপ্রকাশকে সুখদেব মিশ্র কিনিয়ে দেন। বহুদিন থেকে উনি তরাই অঞ্চলে কাজ কারবার চালাচ্ছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশকে উনি চিনতে পারেননি। মস্ত বড়লোক বলে খাতির করতেন।

সুখদেবের পুত্র বলদেব লায়েক হোয়ে উঠল। চোরাকারবারের ঘাঁটি লামাদের মঠের সঙ্গে কারবার ফাঁদলে। তারপর এক বুদ্ধ লামা বলদেবকে জানালেন জ্ঞানপ্রকাশের আসল পরিচয়। আর একটি কথাও জানালেন—লুতাত্ত্ব। মহাপবিত্র মহামন্ত্রপুত সেই দ্রব্য আছে



জ্ঞানপ্রকাশের কাছে তাই ঐ বংশের অত বাড়বাড়ন্ত। ক্ষেপিয়ে তোলা হোল বলদেবকে। বলদেব সঙ্কল্প করলেন, যে কোনও উপায়ে সেই মহাপবিত্র বস্তুটিকে হস্তগত করতেই হবে।

এধারে জ্ঞানপ্রকাশ লামা মঠের শিষ্য হয়েছেন। প্রেতচর্চা শুরু করেছেন। মৃত্যুর পরের জীবনটা জানবার জগ্রে তিনি আকুল। গুরুর পরামর্শে তুলসীকে জোগাড় করেছেন। ষোড়শোপচারে প্রেত-সাধনা শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে। কোনও দিকে কোনও ঝামেলা নেই।

কোথাও কিছু নেই, তুলসী উধাও হয়ে গেল।

কি ভাবে উধাও হোল তুলসী, সেইটাই এক রহস্যজনক ব্যাপার। বলদেও মিশির দেখল তুলসীকে সাইকেলে চেপে ছুটতে। দেখে বলল, ওকেই আগে চাই। নৃতাতন্ত্র যত পবিত্র বস্তুই হোক তার চেয়ে অনেক দামী জিনিষ হোল ঐ সাইকেলে চড়া খুবসুরতীয়া।

যিনি নৃতাতন্ত্রের জগ্রে ক্ষেপিয়েছিলেন তাঁকেই ধরে পড়ল বলদেব, —তুলসীকে পাইয়ে দাও।

জ্ঞানপ্রকাশ জানতেও পারলেন না, তাঁর গুরুদেব মেয়েটাকে সম্মোহিত করে কি হুকুম দিলেন। একদম বেহুঁশ অবস্থায় তুলসী বলদেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল। যাবার সময় জ্ঞানপ্রকাশের রিভলবারটিকেও চুরি করে নিয়ে গেল। বুদ্ধ লামা জ্ঞানপ্রকাশকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলেন। সম্মোহিত করে যা হুকুম করলেন তিনি তুলসীকে, তুলসী তাই করলে।

মেয়েটা হারিয়ে গেল, জ্ঞানপ্রকাশ শয্যা নিলেন। সেই শয্যা থেকে তিনি আর উঠলেন না। মরার পরে তিনি জানতে পারলেন কোথায় আছে তুলসী। যার কাছে আছে তার পরিচয় পেলেন। বুঝতে পারলেন, বলদেও মিশির তাঁর বংশের মান মর্যাদা ধ্বংস করবেই।

বিদেহ জ্ঞানপ্রকাশ সর্বপ্রথম নষ্ট করলেন তাঁর গুরুর ক্রিয়াটিকে।

তুলসী হুঁশ ফিরে পেল। কোথায় কি অবস্থায় আছে সে বুঝতে পারল। তারপর পালাল বলদেও মিশিরের আশ্রয় থেকে।

এধারে লামারা বলদেবকে দিয়ে শচীনন্দনকে ধরে নিয়ে গেল। শচীনন্দন হয়তো জানতে পারে কোথায় সেই লুতাতন্ত আছে। ওধারে তুলসী পালিয়ে এসে বরুণের কাছে ধরা দিলে।

শেষটুকু খুবই সংক্ষিপ্ত।

বলদেও মিশির তুলসীর জন্তে লামাদের মঠ পোড়ালে। ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক লামা তখন তুলসীকে আনবার জন্তে সশরীরে গিয়ে হাজির হোল জ্ঞানপ্রকাশের বাড়িতে। বরুণের হাতে ঘায়েল হয়ে পালাচ্ছিল বেচারী, একতলায় নেমে থাম চাপা পড়ে ম'ল। মরিয়া হয়ে উঠেছে তখন বলদেও মিশির, নিজেও জখম হয়েছে। তুলসীকে খুন করবার জন্তে লোক পাঠালে। খুনেরা তুলসীকে না পেয়ে বেচারী গোপীনাথকে মেরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলে।

তারপর তুলসী স্বেচ্ছায় গিয়ে ধরা দিলে বলদেও মিশিরের হাতে। ব্যাপারটি কিন্তু অল্প রকম। বরুণকে ধাক্কা মেরে যখন চলে যায় তুলসী তখন ওর ওপর প্রেতাবেশ হয়েছে। যে লামা ঐ বাড়িতে থাম চাপা পড়ে মরেছিলেন, আগের দিনে রাত্রে তিনিই শচীনন্দনের ওপর আবিষ্ট হয়ে বরুণকে শেষ করতে চেষ্টা করেছিলেন। পরের দিন তিনি তুলসীকে পেয়ে বসলেন। গোপীনাথের দেহটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে দেখে তুলসীর জাগ্রত মন অসাড় হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে ঐ প্রেতটি দখল করল ওকে। সারা দিন এবং অর্ধেক রাত পর্যন্ত প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় কাটাল তুলসী। তারপর ছুটল বলদেও মিশিরের কাছে। অন্ধকার রাতে সোজা ছুটে লাগল, মাইলের পর মাইল ছুটে ভোরের আগে পৌঁছল বলদেও মিশিরের সামনে। বলদেও হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল, সান্ধ্য যম বরুণ সেন যে তুলসীর পেছনে



রয়েছে, এটা বেচারা জানতেও পারল না।

বরুণ দেখল, বলদেও তুলসীর গায়ে হাত দিলে। যা কিছু করলে বলদেও সবই আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলে বরুণ। জ্বলল আগুন।

আগুন জ্বলে উঠল বরুণের বুকে। আগুন জ্বলে উঠল তুলসীর শরীরে। যে আগুন জ্বলে উঠল তুলসীর শরীরে তাতে সংবিৎ ফিরে পেল তুলসী। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার ফলে লড়তে লাগল সে বলদেবের সঙ্গে। বরুণ কিন্তু তখন উধাও হয়েছিল।

তারপর পলায়ন। বলদেও মিশিরের বাড়ি থেকে একখানা সাইকেল নিয়ে পালাল তুলসী। বলদেও বাধ্য হয়ে আর এক চাল চাললে। এক সরকারী হুজুর বলদেও মিশিরের নুন খেতেন, তিনি সাইকেল মুদ্র তুলসীকে ধরে চালান দিলেন।

বাঁচল তুলসী, অপরাধ স্বীকার করে জেলে গিয়ে বলদেও মিশিরের খপ্পর থেকে উদ্ধার পেল।

যে আগুন বরুণের বুকে জ্বলল তুলসী তাইতে পুড়ে ছাই হোল একে একে চারজন। বলদেও মিশির, তার বুড়ো বাপ মুখদেও, বলদেও মিশিরের একমাত্র ভাই হরদেও আর সেই সরকারী হুজুরটি যিনি তুলসীকে ধরে চালান দেন।

জ্ঞানপ্রকাশ সেনের বংশ যাতে জানতে না পারে নিজেদের পরিচয় তাই অতগুলো খুন করেছে বরুণ, এই হোল তুলসীর ধারণা।

তা' তো নয়। পুরুষ বরুণ সেনের বুকে তুলসী যে আগুন জ্বালিয়েছিল সেই আগুন নারীই জ্বালাতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, তুলসীর নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। বরুণ সেন তাকে নারীর মর্যাদাই ষোল-আনা দিয়ে গেছে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা ও বেচারীকে জানিয়ে কি লাভ হবে! হয়তো বেচারীর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেমন ভুল বুঝে শাস্তিতে বেঁচে আছে তেমনিই থাকুক না।

থাকুক আমার কোনও আপত্তি নেই। তুলসীর আত্মকাহিনী  
তুলসীকে শোনাতে যাচ্ছি না আমি। আমার ওপর কচিরামের অবস্থা  
আস্থা, কচির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি  
ফেসাদে পড়ব!

শেষ



